দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২০। ২০ টাকা

ভয়েস মার্ক

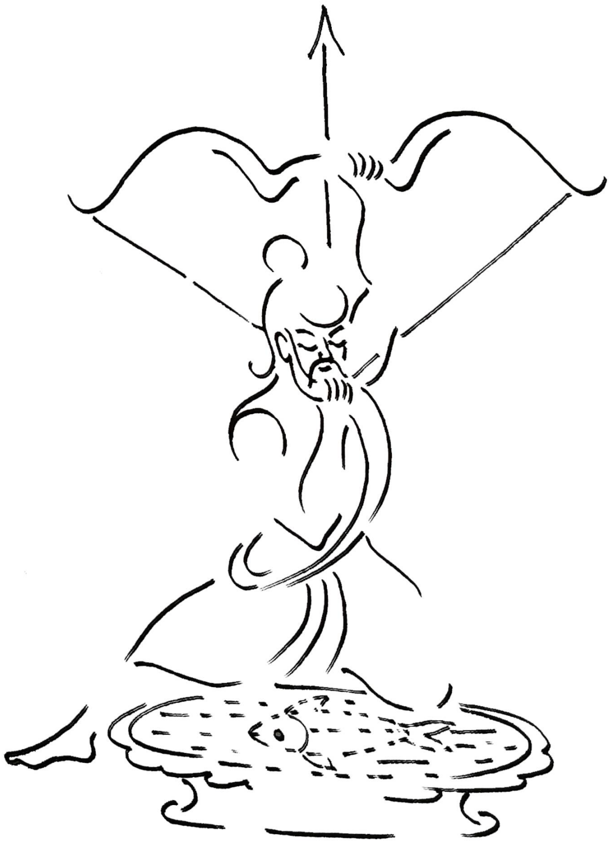

কেন্দ্রীয় বাজেট ▸▸ এনপিআর বিতর্ক ▸▸ আর্থিক সংকট ▸▸ বাংলা বানান ▸▸ অনুষ্ঠানে অশ্লীলতা ▸▸ দর্শন, সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা ▸▸ প্রজন্ম প্রতিরোধ ▸▸ কালচার ▸▸ গল্প ▸▸ কবিতা

ভয়েস মার্ক

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক
মোঃ আযাদ হোসেন

প্রতি সংখ্যার মূল্য ২০ টাকা
গ্রাহক চাঁদা সডাক ১০০ টাকা। যে কোনো সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
গ্রাহক পরিষেবায় যোগাযোগ : রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২

পত্রিকার যোগাযোগ স্থান

বহরমপুর : ৯৯৩২৮৩৭১৮৫
বর্ধমান : ৮১১৬২৭৯১৫২
বাঁকুড়া : ৯৩৭৮৪৮০১৯২
দ: ২৪ পরগণা : ৮৯২৬৭৪৪১৪০
উত্তরবঙ্গ : ৯৪৩৪৬৫৫৬১০

যোগাযোগ

ভগবানপুর, আষাঢ়িয়াদহ
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৪৮.
E-mail: voicemark19@gmail.com
Mob: 9932837185 / 9735874384

ভয়েস মার্ক

দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২০।

সম্পাদক
মোঃ আযাদ হোসেন
voicemark19@gmail.com
WhatsApp : 9932837185

গ্রাহক পরিষেবা: রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২

নামলিপি ও প্রচ্ছদ চিত্র : হিমাদ্রী শেখর মজুমদার

মূল্য : কুড়ি টাকা

মোঃ আযাদ হোসেন কর্তৃক ভগবানপুর, আষাঢ়িয়াদহ, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৪৮ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক কিস অফসেট প্রেস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ৭৪২১০১ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়
কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২০ ৩

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ
এনপিআর বিতর্ক ৫
আর্থিক সংকট,
সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ ও করোনা আতঙ্ক ৭
প্রসঙ্গ বাংলা বানান ৯
রবীন্দ্র ভারতীর অনুষ্ঠানে অশ্লীলতা ১১

প্রবন্ধ
দর্শন, সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা ১৩
শ্রীচেতনিক
প্রজন্ম প্রতিরোধ না জন্মনিয়ন্ত্রণ? ১৯
কিংশুক সন্ন্যাসী
কালচার ২২
মিনারুল হক

গল্প
চন্দ্রবিন্দু – একটি না দেখা দেশ ২৭
তানিয়া খাতুন
অনুসন্ধান ৩০
সুকৃতি
প্রেরণা ৩৩
নীল

কবিতা
বুকের উঠোনে ৩৫
গন্তব্য ৩৫
তুষার ভট্টাচার্য
জুরাসিক বিষ ৩৬
ফিরোজ অনীক
তোমাকে বলছি ৩৭
নীল
বসন্ত ৩৮
মিনারুল হক
হক কথা ৩৯
মানিক জ্যোতি দাস
নতুন ৪০
স্বরূপ পাল

'অস্তিত্ব' প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

১। অস্তিত্বঃ প্রবেশিকা (২১টি প্রবন্ধ)	১৫০.০০
২। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ এক	২০০.০০
৩। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ দুই	২০০.০০
৪। দেহমনের নিয়ন্ত্রণ এবং ...	১৩০.০০
৫। জীবন দিশারী 'অস্তিত্ব'	৩০.০০
৬। মেধা প্রতিভা কি ভাগ্য (!) বাচক? কী তার লভ্য প্রযুক্তি?	১৫০.০০
৭। দাম্পত্য প্রযৌক্তিক পরিবার সমিতি	৩০.০০
৮। বস্তু প্রযুক্তি নির্মাণী 'অস্তিত্ব'	২৫.০০
৯। সত্তার অর্গল ভাঙাটাই মনের দরজা খোলার রহস্য	৪০.০০
১০। শ্রমমূল্যের শান্তি রথ	১০০.০০

'অস্তিত্ব' প্রকাশেয় গ্রন্থাবলি

১। পূর্বপ্রসঙ্গ	১৬টি কলম
২। সৃষ্টিতত্ত্ব	২২টি কলম
৩। জীবনতত্ত্ব	৪৮টি কলম
৪। দেহতত্ত্ব	৮টি কলম
৫। জীবতত্ত্ব	১টি কলম
৬। ঋজুতত্ত্ব	৭৪০টি কলম
৭। সরেজমিন বা স্পটলাইট	একটি সিরিজ
৮। একসোডাস কল্লোল (কবিতা)	একটি সিরিজ
৯। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্ত পূর্ব এবং ...	একটি সিরিজ

প্রকাশক: গাইডেন্স ফাউন্ডেশন
ফোন: ০৩৩-২২৮০-৬৭০৯/৫৫০৫
১৯৭ পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৭, (পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে)
যোগাযোগ: ৯৮৩০০৬৯৫২৫
E-mail: emdadul197@gmail.com

সম্পাদকীয়

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২০

দেশব্যাপী অস্থিরতা ও ব্যাপক আন্দোলনের মধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থবাজেট ২০২০-২১ সংসদে পেশ হল। বাজেট পূর্ব আর্থিক সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেশের অর্থনীতির হতশ্রী দশা প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। সমীক্ষায় উঠে আসা বেকারত্ব, শিল্প ও পরিকাঠামো সংকট, কৃষি সংকট, নারী শিশু উন্নয়ন ও নারী সুরক্ষা, শিক্ষার আধুনিকীকরণ, স্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলা প্রভৃতি বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় বাজেটে গুরুত্ব পাবে দেশবাসী এ আশা করেছিল।

কিন্তু বাজেটে কী হল? এ প্রশ্নে যাওয়ার আগে দেশের অর্থনীতি কী অবস্থায় পড়েছে তা বোঝার জন্য একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। অর্থনীতি সামনের দিকে চলছে, নাকি পেছন দিকে তা বোঝার যে সমস্ত মাপকাঠিগুলি আছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান মাপকাঠি হল ভোগ-ব্যয়সূচক। এই সূচকে ২০১৯ এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, গত কয়েক দশকের মধ্যে এই প্রথম দেশের মানুষের ভোগব্যয় কমে গেছে। গত সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছিল গ্রামীন মজুরি বৃদ্ধির হার নিম্নমুখী। এ হার নিম্নমুখী হওয়ার অন্যতম বড় কারণ ক্ষমতাসীন সরকারের জাতীয় কর্ম নিশ্চয়তা আইনের আওতায় (১০০ দিনের কাজ) ক্রমশ বাজেট কমানো।

বাজেটের কথায় ফিরে আসা যাক। অর্থমন্ত্রী শ্রীমতি নির্মলা সীতারামন দীর্ঘ সময়ের বাজেট বক্তৃতার রেকর্ড করেছেন। কিন্তু সর্বকালীন দীর্ঘ বাজেট বক্তৃতা থেকে কী পাওয়া গেল? মোটাদাগে যা নিম্নরূপ–

১। কর্মসংস্থানের কোনো পরিকল্পনা নেই।

২। কৃষিতে নতুন নতুন প্রকল্পগুচ্ছ প্রস্তাবিত হলেও বাজেট বরাদ্দ কমানো হয়েছে।

৩। শিল্প ও পরিকাঠামো খাতে নতুন বিনিয়োগের কোন দিশা নেই।

৪। বাজেটে রাজস্ব ঘাটতি মেটাবার জন্য লাভজনক রাষ্ট্রায়াত্ত্ব সংস্থা যেমন ভারতীয় জীবন বিমা নিগম এবং রেল বেসরকারিকরণ প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

৫। ইতিমধ্যে গতবছর ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা কর্পোরেট ট্যাক্স ছাড় দেওয়া হয়েছিল। এই বাজেটে আরও বিবিধ সুবিধা কর্পোরেটদের দেওয়া হয়েছে। সবই করা হচ্ছে বেসরকারি বিনিয়োগের আশায়।

৬। বাজেটে আর্থিক বৃদ্ধির নমিনাল লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১০ শতাংশ।

৭। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী ও শিশু প্রভৃতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

৮। নিম্ন মধ্যবিত্ত অংশের মানুষের কাছে আয়কর সংক্রান্ত পুনর্বিন্যাসের নামে প্রহসন রাখা হয়েছে।

৯। বাজেট বক্তৃতায় যতটা না অর্থনীতি আলোচিত হয়েছে তার চেয়ে রাজনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদির উদ্ধৃতিগত মিকচার উপস্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের নয়া উদারনৈতিক বিশ্বায়নের আর্থিক মডেল ছাড়া অন্য কোন আর্থিক মডেল নেই। কিছু বছর পূর্বে ভারতীয় জনতা পার্টির থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে পরিচিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কর্তাদের মুখে দেশীয় পুঁজির বিকাশের আধ খ্যাচড়া কিছু কথা শোনা গেলেও বহুজাতিক কর্পোরেশনের রমরমা একমেরু দুনিয়ায় তার প্রাসঙ্গিকতা নেই। কর্পোরেট আধিপত্যই সব। কিন্তু মুক্তবাজারের এই অর্থনীতিকেও চালনা করবার মত উৎকর্ষতা থাকতে হয় প্রশাসনে। বর্তমান সরকারের এই উৎকর্ষতা দেখা যাচ্ছে না।

আর্থিক বৃদ্ধির হার ৪.৫ এ নেমে গেল কেন? এর উত্তর যতটা না অর্থনৈতিক তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক। কর্পোরেট মূল্য কেন্দ্রীকরণে গত ৬ বছরে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। পরিণামে দেশের যাবতীয় সম্পদ কয়েকটি কর্পোরেট সংস্থার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত

হয়েছে। কৃষক, শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসাজীবী মানুষের আয় কমেছে। GST এর গুঁতোয় ও রাতারাতি রহস্যজনক নোট বাতিলের ধাক্কায় এ অংশ ইতিপূর্বেই ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছিল।

রক্ষণকামী বাজার অর্থনীতির সংকটের গোড়ার কথা হল মূল্য তথা পুঁজির কেন্দ্রীকরণ। কিন্তু কেন্দ্রীকৃত এই সামাজিক সম্পদ ব্যক্তিমালিকানায় নতুন কিছু উদ্যোগ সৃষ্টি করলেও এবং সেই বাজারে নতুন ভোগ্যপণ্য নিয়ে হাজির হলেও তার কোন ক্রেতা থাকেনা। রক্ষ অর্থনীতি পড়ে বাজার সংকটে। আর্থিক হাল তখন স্ট্যাগনেশন (Stagnation) থেকে স্ট্যাগফ্লেশনের (Stagflation) দিকে এগিয়ে যায়। অর্থনীতির পরিভাষায় স্ট্যাগনেশন হল দীর্ঘ সময়ের ধীর আর্থিক বৃদ্ধি এবং ব্যাপক বেকারত্ব। আর স্ট্যাগফ্লেশন হল যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার উর্দ্ধমুখী, আর্থিক বৃদ্ধি ধীর এবং বেকারত্ব ক্রমবর্ধমান। ব্যাপক আর্থসামাজিক সম্পদ যাদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে যায় তাদের অর্থাৎ সেই কর্পোরেটদের তখন কাড়িকাড়ি টাকা কর ছাড় দিলেও সেই বাজার সংকট কাটে না। এরকম বন্ধ্যা দশাই দেখা যায়।

তাই বাজার অর্থনীতিকে পুজো করা নরম জাতীয়তাবাদই হোক আর চরম জাতীয়তাবাদই হোক তার হাতে মানবতা লাঞ্ছিতই হতে থাকে। লাঞ্ছনার মাত্রাগত রকমফের থাকে মাত্র। সেই রকম ফেরে অতি জাতীয়তাবাদী বৈশিষ্ট্য হল সমস্যাকে সমস্যারূপে সে দেখতে দিতেই চায়না। হরেক রকম আর্থসামাজিকভাবে নন ইশ্যুকে ইশ্যুরূপে তার অধিনস্ত মিডিয়ার সাহায্যে গণ মানুষের সামনে হাজির করে। যেমন— তোমরা ক, তোমাদের যাবতীয় দুদর্শার জন্য ওই খ এরা দায়ী। অথবা দেশে এখন নাগরিক অনাগরিক চিহ্নিত করা জরুরি। ইত্যাকার নানান হট্টগোলে রামরাজ্যের নামে রাবণরাজ কায়েম করে।

পূর্বের সরকারটির ক্ষেত্রে কর্পোরেট প্রভু নীতিবৈকল্যের অভিযোগ করেছিল। যুক্তি ছিল, সরকার জনতার জীবনমানের অজুহাতে আর্থিক বিকাশের গতিরোধ করছে। ইউপিএ ১ ও ২ পর্বে প্রাইভেট পুঁজি ও জনস্বার্থের মধ্যে একটি উদারপন্থী ব্যালান্স রাখার চেষ্টা করছিল। যাতে কর্পোরেট মুনাফার হার তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছিল না। তার থেকে যেনতেন প্রকারে বেরতে গিয়ে উদার অর্থনীতির জন্ম-রোগ দূর্নীতির অভিযোগে সরকারটি জেরবার হয়ে পড়েছিল। এতে নীতিবৈকল্যের প্রশ্নটি দানা বেঁধেছিল। সেখান থেকেই কর্পোরেট প্রভুর নতুন প্রজেকশন ছিল গুজরাট মডেল।

এই মডেলের যে হাল তা আগেই উল্লেখিত। তাহলে এর বিরুদ্ধে নীতিপঙ্গুত্বের অভিযোগ নেই কেন? এখানেই পার্থক্য কংগ্রেসের মুক্তবাজার পরিচালনা আর বিজেপির মুক্তবাজার পরিচালনার মধ্যে। উদার অর্থনীতির দুর্নীতি সমস্যার সমাধানে মানে দুর্নীতিকে প্রকাশ্যে না আসতে দেবার আইন অর্থাৎ ইলেকটোরাল বন্ডের মাধ্যমে রামচালাকি। যাতে পার্টি ফান্ডে টাকার ব্যবস্থাও হয় আর তা প্রকাশ্যে আনার দায়ও না থাকে। তাতে কর্পোরেটকেও বাঁধা যায়। তার মধ্যে আতঙ্ক সংক্রামিত করা যায়। মনে দুঃখ কিন্তু প্রকাশের নেই উপায়। কিছুদিন আগে রাহুল বাজাজের স্বীকারোক্তিই যার প্রমাণ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মুক্তবাজারি এই অর্থনীতি তা উদার হোক কী চরম হোক (গুজরাট মডেল) সংকট অতিক্রম করতে পারেনা। স্ট্যাগনেশন থেকে স্ট্যাগফ্লেশন সংক্রমণ করে। দেশবাসীর প্রশ্ন, এই বদ্ধাবস্থা থেকে বেরবার পথ? বার বার উল্লেখ্য, মানুষের জীবনে দুটি অর্থনীতি ১। পরিকল্পিত অর্থনীতি, ২। মুক্তবাজার অর্থনীতি। এই মুক্তবাজার অর্থনীতিকে লাগাম পরিয়ে পরিকল্পিত অর্থনীতি প্রণয়েনই মুক্তি। তার জন্য দরকার ব্যক্তি ও আর্থসমাজের পাণ্ডব-কৌরবী মেরুকরণ। মেরুকৃত সেই আর্থসমাজের কুরুক্ষেত্রে কৌরবদের নিয়ে গিয়ে সম্মুখ সমরে পাণ্ডবী নেতৃত্বের বিজয় অর্জন। তাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্ম। অর্থনীতি পায় গতি।

সেই পাণ্ডব হয়ে ওঠার সাধনাতেই আর্থসমাজে জন্ম নিতে পারে অভ্যুত্থানি নেতৃত্ব। যা নীতি পঙ্গুত্ব বা নীতি বৈকল্যের সংক্রমণ করেনা।

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ

এনপিআর বিতর্ক

বাজপেয়ী সরকারের আমলে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০০৩ পাশ হয়। এই আইন অনুযায়ী নাগরিকতা আইনে সেকশন ১৪এ সংযুক্ত করা হয়। এই আইনের ভিত্তিতে সিটিজেনসিপ রুল ২০০৩ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনে ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার তৈরির কোনো উল্লেখ না থাকলেও সিটিজেন রুলের দ্বারা তৎকালীন সরকার ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়।

এনপিআর এর উক্ত রুল অনুযায়ী ১২ টি তথ্য সংগ্রহের কথা বলা হয়। সেই তথ্যগুলি রুল অনুযায়ী কোনোটিই অপশনাল নয়। বরঞ্চ ভুল তথ্য প্রদান করলে আর্থিক জরিমানার বিধিও তাতে আছে। এই ১২ টি তথ্য হল– নাম, বাবার নাম, মায়ের নাম, লিঙ্গ, জন্ম তারিখ, জন্মস্থান, বসবাসের ঠিকানা (বর্তমান ও স্থায়ী), বিবাহিত কিনা (বিবাহিত হলে দাম্পত্য সঙ্গীর নাম), দেহের সনাক্তকরণ চিহ্ন, নাগরিক নিবন্ধনের তারিখ, নাগরিক নিবন্ধনের ক্রমিক নম্বর, ন্যাশনাল আইডেন্টিটি নম্বর।

২০১০ সালে ইউপিএ সরকারের আমলে এনপিআর চালু করা হয় দেশের নির্দিষ্ট অংশে। এই সময় উক্ত রেজিস্টারের জন্য এই তথ্যগুলি ছাড়া অন্য কোনো তথ্য চাওয়া হয়নি।

২০০৩ সালে প্রণীত অ্যাক্ট অনুযায়ী এনপিআর এর লক্ষ্য হল ভারতীয় নাগরিকদের নিবন্ধীকরণ ও জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদান। কিন্তু সেটি করার জন্য যে রুল বানান হল তাতে বলা হল নাগরিক চিহ্নিত করে National Register of Indian Citizen বা NRC এর কথা। ইউপিএ সরকার এই পদক্ষেপের দিকে যায়নি। উক্ত ১২ টি তথ্যের ভিত্তিতে ২০১০ সালে তারা জনসংখ্যা পঞ্জি তৈরি করেছে। এনডিএ সরকার ২০১৫ সালে তা আপডেটও করেছে। কোনো সমস্যা হয়নি।

তাহলে এখন বিতর্ক কেন? আসলে ২০০৩ এর রুল অনুযায়ী এনপিআর বা জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জিকরণ NRC বা জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকরণের প্রথম ধাপ। ২০০৩ এর আইনে যাই বলা থাক রুল এ যা ব্যাখ্যা দেওয়া হল তাতে জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জিতে আরো কতগুলো তথ্যক্ষেত্র না ঢোকালে সেই উদ্দেশ্য পূরণ করা যায় না। তাই জন্য এনডিএ সরকার ২০১৯ এ জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জির পাইলট প্রোজেক্টে অতিরিক্ত ৮ টি তথ্য ক্ষেত্র সংযুক্ত করেছে। সেগুলি হল– বাবা-মায়ের জন্ম তারিখ, বাবা মায়ের জন্মস্থান, আধার নম্বর, পাসপোর্ট নম্বর, মোবাইল নম্বর, ভোটার কার্ড নম্বর ও মাতৃভাষা। এখানেই বিতর্ক।

নাগরিকতা আইন ২০০৩ এ সংযুক্ত 14A ধারা অনুযায়ী এনপিআর এর ঘোষিত লক্ষ্য নাগরিকদের নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদান হলেও সেই সূত্রে প্রণীত রুল অনুযায়ী লক্ষ্য দাঁড়ায় নাগরিক চিহ্নিত করণ। পরিণামে নাগরিক চিহ্নিতকরণ বিতর্কের মাঝে এনপিআর এর তথ্য সংগ্রহ সেই বিতর্ককে আরো জোরদার করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কর্তাদের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। কেউ বলছেন এনপিআর এর তথ্য ঐচ্ছিক আবার কেউ বলছেন বাধ্যতামূলক। আজ বলা হচ্ছে যা, কাল তার উল্টো। কিন্তু সবই বলা হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমের সামনে। সরকারি কোনো আদেশনামা নেই। আবার ২০০৩ এর রুলে না থাকা অতিরিক্ত ৮ টি তথ্য পাইলট প্রোজেক্টের টেস্ট ফর্মে উল্লেখ করা হল। পরে ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হল টেস্ট ফর্মের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য ফাইনাল। কিন্তু ব্যাখ্যা দেওয়া হল না কোন আইনি ভিত্তিতে এই অতিরিক্ত ডাটা-ফিল্ড সংযুক্ত করা হল?

গোড়ায় গলদ

১) ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব আইন লাগু হয় ৩

ডিসেম্বর, ২০০৪ সাল থেকে। কিন্তু ২০০৩ সিটিজেনসিপ রুল তৈরি হয় ১০ ডিসেম্বর, ২০০৩ সালে। অর্থাৎ আইনই হল না রুল হয়ে গেল।

২) ১৫ জুলাই, ২০০৯ সালে স্বরাষ্ট দপ্তর এনপিআর চালু করার ঘোষনা দিল। ১৫ মার্চ, ২০১০ এ এনপিআর এর কাজ শুরু হয়। ১ লা এপ্রিল ২০১০ থেকে ৩০ শে সেপ্টেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ চলে।

৩) ২০০৩ এর আইনের সেকশন ১৪এ তে এনপিআর কথা বলা হলেও কীসের ভিত্তিতে এনপিআর হবে তা বলা হল না।

৪) সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা মৌলিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত। এনপিআর এর ডাটা এই অধিকার লঙ্ঘন করে। যদিও রাষ্ট্র মৌলিক অধিকার ভায়োলেট করতে পারে কিন্তু তার জন্য দরকার হয় বৈধভাবে প্রণীত আইনের। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন ও সেই আইনের সূত্রে প্রণীত বিধি দুই-ই বৈধতার ক্ষেত্রে প্রশ্নবাচক।

সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ২০১৯ এর সাংবিধানিক বৈধতা ও এনপিআর ইত্যাদি সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। কোর্টের রায়ই উপযুক্ত প্রশ্ন গুলির বস্তুবাচক জবাব দেবে বলে আশা করা ছাড়া আর কিবা পন্থা আছে?

পুনশ্চঃ সংসদের চলতি অধিবেশনে কয়েকদিন আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এনপিআর প্রশ্নে কয়েকটি বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

১) এনপিআর এ কোন কাগজ চাওয়া হবে না।

২) এনপিআর এর কোন তথ্যই বাধ্যতামূলক নয়।

৩) এনপিআর এর ভিত্তিতে কোন নাগরিককে 'D' অর্থাৎ Doubtful বা সন্দেহজনক হিসেবে ঘোষনা করা হবে না।

এই বিবৃতির পর বিরোধী দলগুলি এবং যারা দেশব্যাপী NPR-CAA-NRC বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করছেন তাদের তরফেও সিটিজেনসিপ রুল ২০০৩ এর সংশোধনী দাবী করা হয়েছে। কারণ সংসদে বিবৃতি জারি করলেই তা আইন হয়ে যায় না। এখন দেখার বিষয় সরকারের তরফে এ ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে এই বিষয়টি ক্ল্যারিফিকশনের উপর নির্ভর করছে জাতীয় জনগণনার মত সিরিয়াস সার্ভের ভবিষ্যৎ।

তথ্যসূত্র:-

1. Scroll in Magazine এ প্রকাশিত Article, Citizenship Tangle, Shoaib Daniyal, Nithya Subramaniyah.

আর্থিক সংকট, সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ এবং করোনা ভাইরাস আতঙ্ক

গত ত্রৈমাসিকে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৪.৭ শতাংশ। নোটবাতিল পরবর্তী তিন বছরে অর্থনীতির সংকট ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। যুক্ত হয়েছে ব্যাঙ্কিং সংকট। অর্থমন্ত্রী ব্যাঙ্ক মার্জার ঘোষণা করছেন। বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিও ক্রমশ সংকটের আওতায় চলে যাচ্ছে। যেমন Yes bank। বাজেটেও কথার ফুলঝুরি ওড়ানো ছাড়া পলিসিগত কোন দিশা নেই, যাতে বাজার সংকট কাটে। দেশি ও বিদেশী বিনিয়োগকারীরা ডিমাণ্ডহীন বাজারে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী নয়। এই ডিমাণ্ডহীনতা বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলোরও সংকটের কারণ। একই সঙ্গে দেখা দিয়েছে চরমতম বেকারত্ব। বিগত কয়েক দশকের মধ্যে এই প্রথম Consumption ratio কমে গেছে মারাত্বকভাবে।

দেশের ৬০% কর্মক্ষম জনতা তারুণ্যের কোঠায়। এই তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনীতিকে শক্ত জায়গায় নিয়ে যাবার সম্ভাবনাকে গলা টিপে মারা হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রহীন এই যুবজন কী করবে, কোন রাস্তা নেবে? তাদেরকে ধরানো হয়েছে রক্ষণকামের সবচেয়ে সস্তা ও নৃশংস বাহন সাম্প্রদায়িক ব্যাটন। গত ছয় বছরে ক্ষমতাসীন দল তার মেশিনারি, মিডিয়া ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে এই সংক্রমণ সর্বাত্মক স্তরে নিয়ে যাবার কাজে লাগিয়েছে। গত দিল্লি নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক পাশা খেলার পরিণামে দাঙ্গার মত ভয়াবহ ঘটনায় প্রায় ৫৩ জনের মত নাগরিক প্রাণ হারিয়েছে। হাজার হাজার গৃহহীন। ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দেশের রাজধানীর মত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তিনদিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত দাঙ্গা চলতে দেওয়া হয়েছে। যার পরিণামে বিদেশের মাটিতে দেশের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশ একের পর এক উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, করছে।

নাগরিকত্ব আইন (২০১৯) কে কেন্দ্র করে যে অসন্তোষ দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে সেই আবহে ডায়ালগহীনতা, অনমনীয়তা এই পরিস্থিতিকে জটিল করে দিয়েছে। দুর্জনরা বলছেন দেশচালকরা পেটি পলিটিক্স, কিংবা Personal Ego দ্বারা চালিত হচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক হানাহানি বিনিয়োগ নিরুৎসাহী পরিবেশ সংক্রামিত করেছে।

এরূপ স্ট্যাগন্যান্ট ও অস্থিরতার ভয়াল আবহে চিনে উৎপন্ন COVID-19 রোগ যা করোনা ভাইরাস থেকে ছড়াচ্ছে, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। WHO এর হিসেবে এ পর্যন্ত ৯৪০০০ জন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। প্রায় ৩২০০ মানুষ এ পর্যন্ত মারা গেছেন। ইতালি, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ইরান প্রভৃতি দেশেও তা ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংকট হিসেবে রোগটি প্রতীয়মান হচ্ছে। ভারতে এর সংক্রমণ এখন পর্যন্ত ৩০ জনের দেহে মিলেছে। সরকার দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কিংবা নাগরিকতা, অনাগরিকতা ইত্যাকার বিষয়ে নিজেদের এমনভাবে জড়িয়েছে যে, Endemic এই স্বাস্থ্য সংকট ঠেকানোর Action plan ঠিক করতে পারছেনা। দেশের অর্থনীতির মন্দগতি থাকলেও পৃথিবীর আর্থিক পরিস্থিতি ততটা সংকটে নেই। কিন্তু এই মারণ রোগের থাবা খুব শীঘ্রই অর্থনীতিতে গ্লোবাল রিসেসন সংক্রামিত করতে পারে।

এরূপ অবস্থায় সংকটের ত্র্যহস্পর্শে দেশের হাল কী, ভাবনায় আনা যাচ্ছে?

মুক্তবাজারের প্রবক্তারা (ড. মহমোহন সিংহ) ত্রি-পয়েন্ট সমাধান সূত্র দিয়েছেন (The Hindu, op-ed, 6th march 2020)। প্রথমত, সরকার COVID-19 এর বিপদ মোকাবিলায় সমস্ত ফাণ্ড ও প্রয়াস করুক এবং যথেষ্ট প্রস্তুতি-পরিকল্পনা তৈরি রাখুক। দ্বিতীয়ত, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (২০১৯) হয় প্রত্যাহার করুক অথবা সংশোধন করুক। এবং এর মাধ্যমে সামাজিক অস্থিরতা দূর করে জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করা সম্ভব। এবং তৃতীয়ত, এমন একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিক যাতে ভোগব্যয় চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ঘটে।

প্রথম দুটি নিয়ে বলবার বিশেষ কিছু নেই। কেবল এই কথাটি যে, সরকারের বর্তমান প্রকৃতি অনুযায়ী তারা কি কথা শুনবেন? করোনা নিয়ে আতঙ্ক ছাড়া সরকারের প্রস্তুতি দিশা কিছু আছে বলে এখন অব্দি দেখা যাচ্ছে না। স্বাস্থ্য দপ্তর, শিক্ষাদপ্তরের Advisory জারি করা ছাড়া। দ্বিতীয় পয়েন্টে Citizenship Amendment Act (2019), NPR, NRC ইত্যাদি নিয়ে এমন এক ঘেরাটোপ শাসক দল নিজেই বানিয়ে ফেলেছে তা থেকে তাদের বেরবার খুব একটা ইচ্ছে এবং উপায় কোনোটাই আছে বলে মনে হয় না।

পড়ে রইল, অর্থনীতির প্রশ্নটি। উদারবাদী বিশ্বায়নের অর্থনীতির প্রবক্তা হতে গেলেও যেমন দক্ষতা বা উৎকর্ষতা সরকারের থাকা দরকার তা এই সরকারের নেই, তাতে কারুর সন্দেহ আছে কি? একের পর এক বাজারের প্রবক্তাদের রাজসভা ছেড়ে চলে যাওয়াতে তা আরো প্রমাণিত হয়েছে। এখন কেবল গুটি কয়েক আমলা, আর সবেধন নির্মালা সীতারামন। তিনিও যে সেই কাজটিতে দৃঢ় নন তার প্রমাণ তাঁর বাজেট।

তাহলে সরকার চলছে কি বিরাট শূন্যতায়? হ্যাঁ, তাই। সরকারের কাজকর্ম কিছু কর্পোরেট হাউসের স্বার্থ সংরক্ষণ ছাড়া আর কিছু আছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন না।

অতঃপর, মনমোহন সিংহের নেতৃত্বে যে সরকারের নীতিপঙ্গুত্বের বিষয়ে কর্পোরেটকুল নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদিকে প্রজেক্ট করছিল আজ তাঁরা সরকারের ষষ্ঠবর্ষে এসে সেই একই নীতি পঙ্গুত্বের অভিযোগ করছে না কেন? কিছুদিন আগেই তাদের এক প্রতিনিধি জানিয়েছিলেন সবাই আতঙ্কে রয়েছেন। সবাই কি আতঙ্কে রয়েছেন নাকি কেউ কেউ মহানন্দে রয়েছেন। যেমন আম্বানি বা আদানি। এদের গত ছয়বছরে মুনাফার হার বিশ্লেষণেই সেই প্রশ্নের উত্তর মিলবে। সর্বসাকুল্যে বলা যায় কর্পোরেটগুলোর একচেটিয়া কায়েম হয়েছে। সরকার পক্ষীয় একটি অংশ সমস্ত ব্যাক আপ পাচ্ছে। বাকিরা ডুবছেন। যেমন রিলায়েন্স জিও তরতর করে উপরে উঠে গেল। ভারতী এয়ারটেল ও ভোডাফোন মুখ থুবড়ে পড়েছে।

এই ধরনের আন্তঃপ্রতিযোগিতায় কর্পোরেট পুঁজির একগোষ্ঠী নামবে, একগোষ্ঠী উঠবে তাতে এমন কিছু নতুনত্ব নেই। আসল কথা কর্পোরেট কুক্ষির হার যা ব্যাপক জনতার জীবনমান কোথায় নিয়েছে সেই প্রশ্নটি। তাতে দেখছি একচেটিয়ায় রমরমা। ফলে সরকারের পারদর্শিতা বা অপারদর্শিতা জনগণের জীবন মরণের প্রশ্নে হলেও কর্পোরেটদের তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। নীতিপঙ্গুত্ব তাই কর্পোরেটদের দিক থেকে নয়। ব্যাপক জনতার দিক থেকে। কিন্তু আসল চিত্র কি তাই? মুনাফার হার উল্লম্ফিত হওয়া সত্ত্বেও ডিমাণ্ডরেখা নেমে গেলে উৎপাদিত ভোগ্যপণ্যের ক্রেতা কে হবে? বাজার কোথায়? এখনকার দিনে তার একটি সমাধান কর্পোরেট কুল করেছে স্বদেশে না হলে বিদেশে পলিসিতে। কারণ কর্পোরেট পুঁজির কাছে বিশ্বটিই গ্রাম। তাই তারা নীতি পঙ্গুত্বের কথা সামনে আনছে না। ভুগছে তারাও। Finance Capital হাতে থাকায় চুপ থাকছে।

Finance Capital অস্ট্রেলিয়াতেও বিনিয়োগ করা যেতে পারে। যেমন আদানির বিনিয়োগ।

অতঃকিম !

সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির মধ্যে দিয়ে ব্যাপক মানুষকে কতদিন বোকা বানিয়ে রাখা যায়? তার উত্তর উদারবাদী বাজার ব্যবস্থাপনার ভিত্তিরূপী গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই কি আশা করতে হবে? সেদিকে তাকিয়েও কি খুব সুবিধা আছে? নির্বাচন মেশিনারি নিয়েও তো অহরহ প্রশ্ন উঠছে। মেশিন ব্ল্যাকমেইল। তাহলে? এসব কতদূর যেতে পারে?

নাৎসি জার্মানি? তার পরিণাম তো বিশ্ব দেখেছে। হিটলারী আত্মহনন। কিন্তু সেই আত্মহননের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত তা মানবজাতির যতটা ক্ষতি করে তার পূরণ কি সহজ সাধ্য? এর উত্তর নিহিত আছে গীতার নিষ্কাম কর্মতত্ত্ব , বুদ্ধের অষ্ট অনাঙ্গিক তত্ত্ব , ইসলামের জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম তত্ত্ব এবং কাল মার্কসের শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্ব- এর সমকালীন প্রায়োগিক বস্তুচিন্তায় আর্যসমাজ নিজেকে সক্রিয় করে কিনা তার উপর। যা আর্যসমাজ সংস্কৃতির চর্চায় সমকাল বস্তুপ্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগ।

প্রসঙ্গ বাংলা বানান

ভাষা ও সংস্কৃতির মানের অবনমন কোন দিকের ইঙ্গিতবাহী? আলোচনাটি জরুরি। কারণ ভাষা ও সংস্কৃতি যে কোন জনপদের সঞ্জীবনী। যা না থাকলে বা বিকৃত হলে সেই জনপদ আর্থসামাজিক জীবনমানে নীচু। কারণ তাতে রক্ষণকামিতা ছাড় পায়। অর্থাৎ রক্ষণকামের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের প্রেরণা সঞ্চারী ভাষা ও সংস্কৃতি না থাকলে মানবতাকে দানবতার পায়ের তলায় চাপা পড়তে হয়। কারণ ভাষা ও সংস্কৃতি তথা শিল্পশৈলীই হল জীবনের সমস্যা উদঘাটন ও তার সমাধান বাচক ইঙ্গিত জ্ঞাপনের ব্যঞ্জনা। যে জনপদের মানুষের অনুভূতি চর্চা অর্থাৎ চেতনার কর্ষণ যত সুক্ষ্ম সেই জনপদের ভাষা ও সংস্কৃতির মানও তেমন উন্নত। আর তাতে রক্ষণকাম তথা দানবতার তত আতঙ্ক। চেতনার চর্চাতেই দানবতা সনাক্ত হয়। তাই দানবতা সবসময় চায় জনপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ রূপ ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানতে।

সারা বিশ্ব যে কর্পোরেট বণিকতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করছে তারা পৃথিবীর প্রতিটি জনপদেই চেতনাশূন্য জড়তন্ত্র কায়েম করতে চায়। সেটি তারা করছে জনপদগুলির ভাষা ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করার মাধ্যমে। একাজ তারা করছে শিক্ষা বিভাগ ও গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে। বিশ্বায়নের মুক্তবাজারে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মান প্রভৃতি দেশের কর্পোরেটরা সেই সেই দেশের মিডিয়া কেবল নয়, অন্যান্য দেশের মিডিয়াও নিয়ন্ত্রণ করছে। যেমন মার্কিন ফক্স চ্যানেল। তারা এ বাংলাতেই তাদের বানানো টিভি প্রোগ্রামগুলিতে আর্থসমাজ থেকে প্রায় মুছে যাওয়া নানান সামন্ত রীতি নতুন মোড়কে মুড়িয়ে পরিবেশন করছে। মাধ্যমগুলিতে প্রচারিত প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু ও ভাষা বিকৃত, খর্বিত করে খিচুড়ি পরিবেশন করা হয়। গণমাধ্যম ছাড়া শিক্ষা বিভাগের অথর্বতা ও অপরিণামদর্শী কাণ্ডে মূল্যবোধ রহিত ও তথ্য সর্বস্ব পাঠক্রম চালু করা হয়।

বিগত সরকারের আমলের শেষ পর্যায়ে বাংলা বানানে সমতাবিধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদদের একাজে নিয়োজিত করা হয়। তাঁরা একটি বানান বিধি প্রণয়ন করেন ও সরকারের কাছে তা চালু করার প্রস্তাব দেন। ইতিপূর্বে এবং বিধিটি প্রণয়নের পরপর শিক্ষক ও ছাত্র মহলের একাংশে এই সংক্রমণ ছড়িয়েছিল যে বানানের কোন নিয়ম নেই, হয় না। যে যেমন খুশি লিখতে পারে। যেমন আপনার ইচ্ছে হল 'পরীক্ষা' বানান আপনি 'পরিক্ষা' লিখলেন, আপনার মনে হল 'শ্রেণি' বানান আপনি 'শ্রেনি' লিখলেন। এই মনোভাব আজকের নতুন নয়। এটি বহু যুগ ধরেই ছিল। এরা কার বাহন হয় তা এরা নিজেই জানেনা। অথচ উল্লিখিত বানান বিধিটিতে যথার্থই বলা হয়েছে— ১। বানান সংস্কার মানে সন্ধি, সমাস, প্রত্যয়, উপসর্গ, অনুসর্গ, ণত্ব-ষত্ব বিধি বাতিল করা হয়নি। ২। উক্ত নিয়মের সাথে সাজুয্য নেই অথচ কিছু বানান রীতি রূপেই চলে আসছে, সেগুলিকে নিয়মবদ্ধ করা হয়েছে। ৩। বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। ৪। যুক্তাক্ষর ভেঙে শিশুবোধ সহায়ক বর্ণ-যোগ গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপটি প্রশংসনীয় ছিল। পর্ষদ ছাড়াও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বই প্রকাশের ক্ষেত্রে বানান বিধিটি ফলো করা বাধ্যতামূলক করা হয়। ফলে রাজ্য থেকে প্রকাশিত বই পত্রে সম বানান চালু করাটা সহজ হয়ে যায়। যদিও 'আকাদেমি বানান অভিধান' প্রণেতারা এই অভিধানের প্রস্তাবিত বিধিকে প্রস্তাবের আকারেই রাখেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির আঙিনায় যারা বিচরণ করেন তারা বিবেচনা করবেন এমন ভাবেই বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। আমাদের বিচারে বাংলা বানানকে নিয়মবন্ধ করণ অবশ্যই ভাষা ও ব্যাকরণ অনুগ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ ছন্দবদ্ধ ভাষা মানুষের পরিশিলিত মননেরই অভিব্যক্তি।

শিশুর ভাষাশিক্ষা তার ভাব প্রকাশক অভিব্যক্তির জন্য জরুরি। ভাব ব্যক্ত করতে বাক্য গঠন, শব্দ চয়ন, বানান অর্থাৎ ভাষার স্তরভিত্তিক সজ্জা বোধ প্রয়োজন। অবশ্য ব্যাকরণের নিয়মে ভাষা গঠিত হয়না। মানব

চেতনার তথা অনুভূতির অভিব্যক্তিই ভাষার সৃষ্টি করে, একথা স্মরণ রাখা দরকার। তাই শিশু চেতনার বিকাশে অর্থাৎ সুকুমার বৃত্তি চর্চার মাধ্যম হিসেবে নিয়ম ও ছন্দবদ্ধ ভাষা থাকা আবশ্যক। একথা ভাষা বিজ্ঞানীরাই বলেন।

তাহলে কোন আক্কেলে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ মূল্যায়নে বানান ভুলে নম্বর কাটা যাবেনা এই ফরমান জারি করেন? এবং সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনা শুরু হতেই তা প্রত্যাহার করেন? বানান ভেদে মূল্যায়নে নম্বর কাটা হবে না নিদান দেন।

সরকার বাহাদুরের এহেন কাণ্ডে কী প্রতিফলিত হয়? আসলে রক্ষণকামী কুচক্র কী রাজ্য কী কেন্দ্র ইতিপূর্বেই শিক্ষার দফারফা করবার জন্য তথ্যভিত্তিক পাঠক্রম চালু করেছে। ভাষার ক্ষেত্রে সরাসরি তা করা যায় না। অথচ শিশুদের নম্বর তোলার প্রতিযোগিতায় আরো ভালোভাবে নামানো দরকার। তাই বানানে ছুঁৎমার্গ রাখলে কি তার ষোল আনা পূরণ হয়?

শিক্ষা বিভাগীয় দায়িত্বে ভাষা তথা বাংলা বানান প্রাগ্রসর মনোভঙ্গিতেই পরিচালন যোগ্য। কিন্তু তা করতে গেলে মনন ও গবেষণাকে প্রাধান্য দিতে হয়। তাতে কোন দিকটি উন্মোচিত হয়? উন্মোচিত হয় ভাষা ও সাহিত্য তথা মননচর্চার অভিব্যক্তিকে সুস্পষ্ট ও সুন্দর শৈলি দেবার দিকটি। সেই লক্ষ্যে চালিত হতে হলে আলটপকা কাণ্ড এড়িয়ে ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে সার্বিক শিক্ষা রূপায়ণী পদক্ষেপ প্রয়োজন। তা করতে কি আমাদের শিক্ষা বিভাগীয় কর্তারা আগ্রহ দেখাবেন?

রবীন্দ্র ভারতীর অনুষ্ঠানে অশ্লীলতা

ঘটনা-১

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বসন্ত উৎসবের অনুষ্ঠানের ঘটনা। কিছু ছাত্র-ছাত্রী তাদের দেহে রবীন্দ্রনাথের গানকে অশালীন ভাষাযোগে মিশ্রিত করে লেখে। যে ভিডিওটি আমাদের সমাজে প্রকাশ পেয়ে গেল গেল রব উঠেছে।

ঘটনা-২

এক বিদ্যালয়ে একটি রবীন্দ্র গানের প্যারোডি করে কিছু অকথ্য ভাষা যোগ করা হয়েছে। এহেন কাণ্ড জনসমাজে হইচই ফেলে দিয়েছে।

সমাজ ও সোস্যাল মিডিয়ার মতামত

কী কুৎসিত সব, ঐ মেয়েগুলি যা করেছে তা আড়ালে করত? এভাবে কেউ সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রকাশ করে? বৃহত্তর সমাজের মতে এই দুটি ঘটনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুখে কালি লেপন করেছে। আমাদের কিছু পরিচিত ব্যক্তিদেরও খুব সুন্দর মতামত নেট দুনিয়ার সুবাদে দেখলাম। এরা সোনাগাছিতে চলে গেলেই পারে। এরা এত নোংরা প্রভৃতি বাক্যালাপ। সকলেই একটা কথা বলতে চাইছে তারা কেন মিডিয়াতে আনল? কেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে করল? কেন তারা রবীন্দ্রনাথের গানের সাথে করল? কেন তারা বসন্ত উৎসবে করল— ইত্যাদি ইত্যাদি?

প্রিন্ট মিডিয়ার বক্তব্য

দুটি ঘটনা নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় গত ১১ মার্চ ২০২০, 'অপশব্দ নিয়ে বিতর্কের কিছু ভালো দিকও রয়েছে', এই শিরোনামে সম্পাদকীয়তে একটি লেখা দেখা যায়। সেখানে এই ঘটনাটির মধ্যে মেয়েদের স্বাধীনতার আত্মপ্রকাশ বলে পজিটিভিটির খোঁজ করা হয়েছে।

ঘটনার কারণ

আসলে ছাত্ররা নিজেদের ফ্যাশন প্রকাশে ও নিজেকে দেখানোর জন্য এই কাজ করেছে। বর্তমান যুব সমাজের নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্র হিসাবে সোস্যাল মিডিয়া একটা বিশাল ভূমিকা পালন করে। সেখানে যে কেউ নিজেকে প্রকাশ করতেও পারে। তার প্রকাশ করার কিছু থাক কিংবা নাই থাক। আর বসন্ত উৎসব সেখানে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তাই তারা অশ্লীল শব্দাবলি ব্যবহার করেছে রবীন্দ্র গানে। সেই সকল শব্দগুলির মিকচারে ভরে শরীরকেই মাধম্য করেছে। এখানের তিনটি বিষয় দেখা যাচ্ছে— ১। অভিব্যক্তিতে অবদমিত যৌনতার প্রকাশ, ২। সেই প্রকাশের ভাষা ও দেহের ব্যবহার অর্থাৎ স্থূল যৌন অভিব্যক্তি। ৩। রবীন্দ্রনাথের গানের কথাকে এই বিকৃতির হাতিয়ার করা।

তাদের এভাবে সঙ সাজনের রুটের কারণে যেতে গেলে বর্তমান আর্থসমাজ সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটটি একটু ভালো করে দেখা দরকার। তাদের এই যে বিকৃত ভাষা ও প্রদর্শন কি হঠাৎ করেই আকাশ থেকে পড়েছে? না আমরা সমাজের আনাচে কানাচে এমনই সব ভাষা ব্যবহার করি। এভাবেই দেহকে পণ্য করে বিকৃত ও অবদমিত জড় কামনায় লিপ্ত হই? অর্থাৎ আর্থসমাজ সংস্কৃতির সুস্থতায় নাকি বিকৃতিতে চলছি, তার উপরই নির্ভর করে আমাদের প্রকাশিত ভাষা, ব্যবহার, আচার আচরণের অনুষ্ঠান। উক্ত ঘটনায় আর্থসমাজ সংস্কৃতির অসুস্থ বিকৃতিই প্রকাশ পেয়েছে।

ঘটনার অন্তর্ঘটনা

ঘটনাটির ভেতরের ঘটনা জানার আগে একটা কথা জানা দরকার। আজ আমরা কালচার বলতে কী বুঝি? কালচার আজ আমাদের মনে ধারণা দেয়, যে বাড়িতে সংগীতের বিভিন্ন সামগ্রী রয়েছে, যে বাড়িতে আলমারি ভর্তি বই, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎ কিংবা শেক্সপিয়র প্রভৃতি মনীষীদের গ্রন্থে ভরা, তবলা, বায়া আরও সব সামগ্রী, যাতে সাজানো রয়েছে বাড়ি-ঘর, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি। আমরা বলি বাড়িটি কালচারড। আবার যারা একটু আধটু সংগীত নিয়ে থাকে, গান গায়, কবিতা পড়ে, কিংবা ধুতি-পাঞ্জাবিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রযোজনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাদেরকেও আমরা কালচারড বলে থাকি। এইগুলিই আমাদের

কাছে আজ কালচার। যার সাথে জীবনচর্চা ও জীবন সমস্যার উদঘাটনের কোনো সম্পর্কই নেই।

এবারে আসা যাক উপরের তিনটি বিষয়ে। প্রথমটি হল বিকৃত ও অবদমিত যৌনতার যান্ত্রিক প্রকাশ। এটি দ্বিতীয়টির সাথেও সম্পর্কিত, যৌনতাকে পণ্য করায়। বিষয় দুটি কেমন? পরিবারসহ সমাজমানসে যৌনতা নিয়ে কেমন অবস্থা বিরাজ করছে। তা সর্বত্রই ঢাকো ঢাকো ভাব। সে পরিবারসহ সমাজ হোক কিংবা স্কুল-কলেজের পাঠক্রমই হোক। কোথাও যৌনতা নিয়ে সুস্থ, মার্জিত শিক্ষা পাঠক্রম নেই। পরিবারেও তার কোনো বস্তুগত অভিজ্ঞতার অভিযোজনা নেই। আছে কিছু ধারণা, কিছু রীতি-রেওয়াজ প্রভৃতি। যার তলাটা আমরা একবারও তলিয়ে দেখি না। তা গোপনে, আধ-গোপনে চলে। যার ফলে শিশুরা কোনো সুস্থ-বিজ্ঞানমনস্ক যৌন শিক্ষা লাভ করতে পারে না। পরিবারেও সুস্থ দাম্পত্যের অনুশীলন থাকে না, তাই সেখানে গজায় অবদমন। আর সেই অবদমিত কামনার কামড়ে যা ঘটে তাই বিকৃতি। অতএব, যে সমাজ তার নাগরিকদের সুস্থ-মার্জিত যৌনতার শিক্ষা দিতে পারে না কিংবা চায় না, সেখানের যৌনতার ভোগ ও দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হতে পারে, আজকের সমাজে ঘটে যাওয়া নারীদের উপর বিভিন্ন অত্যাচার, নিপীড়ন ও জীবনহানিকর অপঘটনাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এরজন্য কে দায়ী? সমাজ তো কোনো একক ব্যক্তি কিংবা পরিবার নিয়ে নয়, কিংবা শুধু জড়সামগ্রীর সমাহারেও নয়। তার সাথে মূল্য বিনিময় ও মূল্য উৎপাদন, পরবতী মূল্য বিকাশের উৎপাদনী সম্পর্কের সাথেই সম্পর্কিত। সেই মূল্য সমাজ বিকাশক না তা সমাজ প্রতিবন্ধক? এখানেই নিহিত আর্থসমাজ সংস্কৃতির ভিত। সেই ভিত মূলটা যে পচনক্রিয়ার ক্যানসারে সংক্রামিত তা এই ধরনের অপঘটনার বার্স্ট আউট মাত্র। ভেতরটা আরো আরো কুৎসিত। আর যারা গেল গেল রব তুলে চিকন কালচারের রূপকে অক্ষত রাখতে চাইছে তারা সেই ক্যানসারের প্রতিশোধন যে চায় না তা তাদের ভাষাতেই ব্যক্ত।

যারা এই বহিঃপ্রকাশ করে ফেলেছে বা ফেলছ তারা কী? না, তারাও ঐ বিকারের উপসর্গের অন্য একটি উপসর্গের স্বীকার। যা চিকন কালচারের অঙ্গ। যার জন্যই তারা রবীন্দ্র সংগীতের কথা ও গানকে হাতিয়ার করে। সেই গানের কথা ও সুর যেহেতু সমাজ মনে চিকন বিশেষণ রূপে বিরাজ করে। অতএব, তাদের বিকৃতির ফ্যাশনে চিকন বিষয়কে অবলম্বন না করলে তো আর সমাজের কাছে নিজেদের বৃহৎ আকারে প্রকাশ করা যাবে না। আর চিকন সমাজও তেমনভাবে নেবে না।

মিডিয়ার ভূমিকা

মিডিয়া এক্ষেত্রে দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। একদিকে যেমন ঘটনাগুলিতে সমাজ একেবারে তলিয়ে যাওয়ার চিৎকার করে। আবার অন্যদিকে সেই সকল ঘটনাকেও মান্যতা দিতে বিভিন্ন ধরনের পজিটিভিটি খুঁজতে থাকে। কিন্তু কখনোই তারা রুটে যেতে চায় না। যদি কোনওভাবে তলার ফুটোটা প্রকাশ পেয়ে যায়। কিংবা যারা সমাজের মূল্য কুক্ষি করে সমাজের এই সকল বিকারের সংক্রমণ করে, তাদেরকে যাতে মানুষ চিহ্নিত করতে না পারে। তাদের আড়াল করতেই কপট মিডিয়া মানুষকে গোলকধাঁধায় ফেলে দেয়। একদিকে তারা এর নিন্দা করে উপর উপর, আর অন্যদিকে ভেতরে ভেতরে এই সব অপঘটনাকে ভ্যালিডিটি দেওয়ার যুক্তি সাজাতে থাকে। কিন্তু কখনোই ঘটনার ব্যাকগ্রাউণ্ডটি মানুষের সামনে আনতেই চায় না, সর্বদা আড়াল করে রাখে তাদের কাপট্যের কপাট খাড়া করে।

প্রবন্ধ

দর্শন, সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা

শ্রীচেতনিক

আর্থসামাজিক বিবর্তনের সূত্র প্রবহমানতার কথা বলে। আবদ্ধতার কথা বলে না। স্রোতশীলতা বা প্রবহমানতার শর্ত হল জীবনচর্চা। জীবনচর্চা শূন্য হয়ে গেলে আবদ্ধতা আর্থসমাজকে গ্রাস করে। জীবনচর্চার শূন্যতার পরিণামে আর্থসমাজে জড়বস্তু প্রধান মানসিকতা সংক্রামিত হয়। এই সংক্রমণের যতগুলি প্রকার (অসংখ্য) তার মধ্যে অন্যতম সেন্টিমেন্ট্যাল সম্প্রদায়বোধ। এই সম্প্রদায়বোধ ধর্ম-ধারণা, ভাষা-ধারণা, আঞ্চলিকতা সহ আরো বিভিন্ন ধরনের ধারণার হতে পারে। জীবনচর্চা শূন্য আদর্শহীনতায় এই সব ধারণার সংস্কার গোটা আর্থসমাজকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে। তবু জনমানস এই সব ধারণা পোষণ করলেও তা সাম্প্রদায়িক চরিত্র পায় না। সম্প্রদায়বোধ সাম্প্রদায়িক চরিত্র নিয়ে নেয় তখনই যখন এই ধারণার সাথে অপরাজনৈতিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক পাতে। এই সম্পর্কের সূত্রেই সাম্প্রদায়িকতা সেই ধারণার সমাজ-মনকে কলুষিত করতে পারে।

জীবনচর্চা জীবনাদর্শ

অভাববোধ থেকেই জীবন বিকাশের উপজীব্য কী তাই নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। কীসের অভাববোধ? তা কি কেবল জড়বস্তুর অভাব? যদি তাই হয় তাহলে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা করলেই তো সেই অভাববোধ তৃপ্ত হবার কথা। হয় কি? হয় না। আবার জড়বস্তুর অভাবও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু সেটাও শেষ কথা নয়। আসলে জড়বস্তুগুলি জীবনের মূল লক্ষ্যপূরণের মাধ্যম মাত্র। সেগুলিই লক্ষ্য নয়। তাই জড়বস্তুগুলির প্রাপ্তিতেও অভাববোধ ঘোঁচেনা। তাই এবার প্রশ্ন আসে জীবনের লক্ষ্যটি কী? সেই লক্ষ্য প্রসঙ্গে ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার সম্পর্কটি কী? ব্যক্তি ও সমাজের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের সূত্রের ভিত্তি হিসেবে কাজ করা শ্রমার্থনীতিটি কী? মূল্য কী? মূল্য ব্যবস্থাপনার কোনরূপে জীবনের সেই লক্ষ্যটি অর্জিত হতে পারে?

মানব জীবন শ্রম নির্ভর। শ্রমনির্ভরতা থেকেই মূল্য বিনিময়ের সামাজিক গ্রন্থিটি রচিত। সামাজিক এই গ্রন্থিটির একক হিসেবে ব্যক্তিসত্তা কোন লক্ষ্যে পদক্ষেপ করে? সে পদক্ষেপ করে বিকাশ লক্ষ্যে। সে ক্ষুদ্র, তাকে বৃহৎ হতে হয়। ক্ষুদ্রতায় তৃপ্তি নেই, মুক্তি নেই। সেই ক্ষুদ্রত্বও তার ভিতরের, সেই বৃহত্ত্বও তার ভিতরের। বাইরেটা তার আধার। ভিতরটা গৌণ হয়ে গিয়ে বাইরেটা মুখ্য হয়ে গেলে তার ক্ষুদ্রত্বও ঘোঁচে না। সে প্রাণবন্তও হতে পারে না, অগ্রসরও হতে পারে না। অর্থাৎ মানব চেতনা বা 'আমি'ই হল মূল। এই 'আমি'র বিকাশ তথা বিসর্গিকতায় হল তার জীবনলক্ষ্য। এই বিকাশের পদক্ষেপের এক একটি ছেদবিন্দুতে যা তার অর্জিত তাই তার ভোগ্য। এই ভোগ্য রূপায়ণ অর্থাৎ বাস্তবায়নেই পরবর্তী বিকাশের অভিযোজন। কিন্তু এই ভোগ্য রূপায়নে সে বাধা পায়। কোনখান থেকে? এই বাধা কি বাইরের, নাকি তার ভিতরেই? এটি তার ভিতরের এবং বাইরেরও। মানব চেতনা বা 'আমি'র বিপরীত শক্তিটিও তার মধ্যেই ক্রিয়াশীল। যা বিকাশ বিরুদ্ধ শক্তি। এই দুই শক্তির দ্বন্দ্বেই তার পথচলা। পথ নির্মাণ। জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম।

অর্থাৎ পথচলার সূত্রেই আসে বাধা। বাধা অপসারণে জ্ঞান তথা জীবন সংক্রান্ত প্রশ্নমালা। প্রশ্নমালার উত্তর সন্ধানেই ব্যক্তি দ্বান্দ্বিক। দ্বান্দ্বিকতায় সেই প্রশ্নমালার উত্তর অর্জনেই আসে জীবনাদর্শ।

আদর্শগত সম্প্রদায় ও তার চরিত্র

জীবন বিকাশ্য শক্তি ও জীবন বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্বেই আদর্শ বা ভ্যানগার্ড চেতনা গঠিত হয়। যা Trans-

former of feeling, motivity and action। এই ভ্যানগার্ড-ই আর্থসমাজের পরিচালক। তো এই ভাবে লব্ধ যে আদর্শ সেই আদর্শের অনুসারি সম্প্রদায় কখনোই সাম্প্রদায়িক চরিত্রের হয় না। এই আদর্শগত সম্প্রদায়ই হল ভারতীয় জীবন দর্শনের ভারতীয় জীবনধারা, আলকোরানিক জীবনদর্শনের ইসলামিক জীবনধারা, মার্কসিজম প্রসূত কম্যুনিজমের জীবন ব্যবস্থা ইত্যাদি। কারণ এগুলি সেই জীবনলক্ষ্যের উপজীব্য অন্বেষণ সূত্রেই কোনোটা আপেক্ষিক, কোনোটা বা চিরায়ত জীবন প্রণালী নির্মাণে ব্রতী। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে ঐ আদর্শ অনুযায়ী কথিত সম্প্রদায়গুলিই তো একে অপরের গলা কাটে? হ্যাঁ কাটে। কিন্তু এমনি এমনি কাটেনা। আর্দশের বস্তুসূত্র অনুযায়ী গঠিত হলেও জীবনচর্চা শূন্যতায় আদর্শটিই যখন জীবন থেকে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে যায় তখন তা সম্প্রদায় নয়। তা তখন সেই আদর্শের সমকাল প্রযুক্ত নিয়মের অন্ধ অনুকার মাত্র। অন্যভাষায় ঐতিহ্যের অন্ধ অনুসারী। যাতে জীবন পুষ্টি পায়না। কিন্তু তা-ই জীবনকে হরেক অনুষ্ঠানে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। অর্থাৎ সেই সম্প্রদায়গুলিই ধারণাবাহী সম্প্রদায় হিসেবে জীবনবিরোধী রূপ নিয়ে সমাজে ভাসতে থাকে। ভাসমান ধারণার এই সম্প্রদায় তখনও সাম্প্রদায়িক চরিত্র নিতে পারেনা। নেয় কখন?

জীবনবিরুদ্ধ শক্তিটি আর্থসামাজিক ক্ষমতাটিকে কব্জা করে নেয়। তার কব্জা বজায় রাখার সহযোগী ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হলেই সাম্প্রদায়গুলি সাম্প্রদায়িক চরিত্র পেয়ে যায়। সেই ক্ষমতাটির স্বরূপ কী? তার স্বরূপ প্রকাশিত হয় জীবন বিকাশে শ্রম-উৎপাদন-মূল্য -মূল্য বিন্যাস ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি অনুযায়ী। অর্থাৎ শ্রম সম্পর্ক কোন মানে সে বিকশিত বা অবরুদ্ধ করে তার উপর। অতি অবশ্যই আদর্শের গলা টিপে ধারণাকে মওকা দিয়ে ধারণাভিত্তিক সম্প্রদায় বোধকে যে ক্ষমতা চাগাড় দেয় তা শ্রম সম্পর্ক বিকশিত করে না। অবরুদ্ধ করে। শ্রম ও মূল্যনীতিকে ড্রাগনী কব্জায় চাপা দিয়ে।

শ্রম ও মূল্যনীতি – ড্রাগনের থাবা

একটু খুলে বলা যাক। শ্রম নির্ভরতায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে শ্রমক্ষেত্রে অংশ নিতে হয়। শ্রমক্ষেত্রের যোগান কে দেবে? ক্ষমতা চরিত্র। তার উৎস কী? তার উৎস আর্থসামাজিক সম্পদ। এই সামাজিক সম্পদ থাকবে কিনা তা নির্ভর করে আর্থসামাজিক ক্ষমতা ও তার ম্যানডেট সাপ্লায়ার সমাজ সংস্কৃতির ধারক গণ-জনতার উপর। ব্যাপারটি কেমন?

শ্রমে অংশ নিয়ে ব্যক্তি যা উৎপাদন করে তা, মূল্য। মূল্যের বিভাজনে আবশ্যিক ও উদবৃত্ত মূল্যের বিন্যাসের সাংস্কৃতিক অভিযোজনা থাকলে উদবৃত্ত মূল্য আর্থসামাজিক সম্পদরূপে আর্থসামাজিক ফাণ্ডেই অর্পিত হয়। যা থেকেই ক্ষমতার ম্যানডেট প্রাপ্ত নেতৃত্ব আর্থসামাজিক প্রকল্প রচনা ও তার বাস্তবায়ন করে। শ্রমক্ষেত্র সংকুচিত হয় না, বেকার সংক্রমণও হয়না। সেই সম্পদ কুক্ষি করার ড্রাগনও আর্থসমাজে তৈরি হয়না। কিন্তু মানব বিকাশের রাধারূপ আবদ্ধতার শক্তি এমনই দু-ধারের করাত যে সে উৎপাদক রূপ মানব অস্তিত্ব অর্থাৎ লক্ষ্মীকে, কুক্ষিকারক রূপ মানব অস্তিত্ব অর্থাৎ গণেশ চরিত্রে সংক্রামিত করে। পরিণামে আর্থসামাজিক বিকাশ্য সম্পদ ব্যক্তির কুক্ষিতে ঢুকে যায়। আর আর্থসমাজে অর্থনীতির চরিত্রটিও হয়ে যায় মুক্তবাজারী। কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ব্যক্তিকুক্ষির বুনিয়াদভিত্তিক এই মুক্তবাজারী অর্থনীতির কবলে তখন গোটা আর্থসমাজটাই পড়ে যায়। আর্থসামাজিক সম্পদের সামাজিকিকরণ না হওয়ায় বেকারত্ব, উঞ্ছবৃত্তি, যৌনবৃত্তি সহ নানান রক্ষণকামী উপসর্গে সমাজ মানস বিকারে ভোগে। আর কী হয়? কুক্ষিবৃত্তির নিয়মই এমন যে বেশিরভাগ মানুষ তাতে সক্ষম হয় না। সেয়ানারাই তাতে সক্ষম। পরিণামে জনপদের সিংহভাগ সম্পদ গুটিকয়েক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পকেটে চলে যায়। আজকের দিনে যাদের নাম- কর্পোরেট গোষ্ঠী। যেমন সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্যাবলী থেকে দেখা যাচ্ছে ভারতের সিংহভাগ সম্পদ মাত্র 67 টি কর্পোরেট গোষ্ঠীর হাতে কুক্ষিগত। এরা কী করে? আর্থসামাজিক ক্ষমতা নেতৃত্ব বানায়, নামায়, তোলে ওঠায়। একদল যায়, অন্যদল আসে। মূল ক্ষমতা থেকে যায় সেই কর্পোরেটদের হাতেই। তাদের জন্যই তাদের বাঁচার মন্ত্রেই আইনসভাগুলি আইন বানায়। প্রয়োগ করে। জনজীবনকে জীবনচার্চিক হতে না দিয়ে নানান

সংক্রমণে তা বিকৃত করে। খণ্ড খণ্ড বোধে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। করে কারণ, ঐ কুক্ষি করা সম্পদ যাতে কারোর নজর না যায়। তার পরেও যদি সে আর্থসমাজে সাংস্কৃতিক কর্ষণ লক্ষ্য করে তখন সে পাগল হয়ে যায়। নামিয়ে আনে মারণাস্ত্র। ধারণাধারী সম্প্রদায়গুলিকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। সাম্প্রদায়িক হানাহানি দাঙ্গার মত অপঘটনায় মৃতপ্রায় মানুষের বুকের উপর দিয়ে চলে যায়।

আদর্শ নির্মাণী 'অস্তিত্ব'

রক্ষণকামী সেই জীবন বিরুদ্ধ শক্তির কবলে আর্থসমাজ তখন ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকে। ছিন্ন ভিন্ন দিক ভ্রান্ত আর্থসমাজের মানুষের মধ্যেই প্রশ্ন উঠতে হয়। কেন এমন? আমরা কেমন আছি, আর কেমন থাকতে চাই। এই প্রশ্নের সূত্র ধরে বস্তুগত ভাবনা সূক্ষ্মতর, গভীরতর, তীক্ষ্ণতর, তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে। সমকাল সমাজ মানসে এই ভাবনাকে লালন করতে হয়। সমাজ মানস তা লালন করেও। পরিণতিতে যুগ সম্ভাবামি সেই সমাজের মধ্যে থেকেই বস্তুত্থিত হয়। যার বস্তুসম্মত সিদ্ধান্ত মহাভারতের চিরায়ত তত্ত্ব—

'পরিত্রাণায় সাধূনং বিনাশয় চ দুস্কৃতাম
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'।

অর্থাৎ অধর্ম তথা দানবতাকে পরাজিত করে ধর্ম তথা মানবতা প্রতিষ্ঠিত করতে যুগে যুগে আমি বস্তুত্থিত হয়। সেই যুগ সম্ভাবমি তখন কী করে? আলকোরানিক মুরসালাত প্রযুক্তিতে যুগ যুগ সংক্রামিত ঐতিহ্যের জঙ্গলকে কুলোর বাতাসে যেমন তুষ উড়ে যায় তেমনি করেই উড়িয়ে দেয়। অতীতের আদর্শকে সমকাল প্রায়োগিক প্রসঙ্গে রূপ দেয়। মানুষের সামনে হাজির করে ঝকঝকে দর্পন। এই দর্পনই 'অস্তিত্ব' দর্শন। তা কীভাবে সূত্রায়িত হয় তার ব্যাখ্যানে না নিয়ে তা মানব জাতিকে কী সার্ভিস দেয় তার আলোচনাটি এখানে প্রাসঙ্গিক।

'অস্তিত্ব' দর্শন

স্পষ্ট মেরুকরণ করে জীবন দিশারী ও জীবন অবরুদ্ধকারী শক্তির। দেখিয়ে দেয় বস্তুগত জীবন ভাবনায় সত্তাদুয়ারে আঘাত হেনে বের করে আনা অতীত জ্ঞান-দর্শনের বর্তমান প্রায়োগিক রূপ। সেই দর্শনে দৃষ্ট জ্ঞান মানব জাতির সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডারের চিরায়ত দিকের উন্মোচন করে। দিক নির্দেশ করে সমকাল আর্থসামাজিক প্রযুক্তির। যে জ্ঞানদর্শন প্রসূত জীবন ভাবনাকে রক্ষণকামিতা (জীবন বিরুদ্ধ শক্তি) ধর্মের সাজনে সাজিয়ে তার আড়াল হয়ে গেছে তার স্বরূপ উন্মোচন করে। মানব জাতির সামনে হাজির করেছে তার অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন, শিল্পশৈলী ও ইতিহাস। যা জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রামেরই ত্রিশূল বর্তিকা। এই ত্রিশূলের প্রজ্ঞাতেই বোধগম্য অতীত জ্ঞান-দর্শনের স্বরূপ। সেই জ্ঞানালোকেই দ্রষ্টব্য ব্যাপটিজম, ইউহুদতত্ত্ব, বেদান্তের দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, ইসলাম ও কম্যুনিজম।

ভারতীয় দর্শন

'অস্তিত্ব' এর আলোকে ভারতীয় দর্শন কোনো মিথ বা কল্পকাহিনীর জঙ্গল নয়। তা পূর্বেই উক্ত সত্তান্দরভেদী ব্যাসতত্ত্বেরই নির্যাস। তা কষ্ট কল্পনা নয়। তা ভাবোদগম, বস্তুদ্যম, পুরুষোত্তম ও আনন্দম। অর্থাৎ তা পুরাণ অর্থাৎ ভাব, বেদ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ, উপনিষদ অর্থাৎ তার সিদ্ধান্তরূপ। মানে কৃষ্ণ অর্থাৎ আনন্দপ্রিয় চেতনার 'রা' অর্থাৎ মুক্তি আর 'ধা' অর্থাৎ মুক্তির চিরায়ত আসনে শ্রীমণ্ডিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হওয়ার তত্ত্ব। এই তত্ত্বেরই আখ্যায়িকা রামায়ণ ও মহাভারতীয় অখণ্ডতা। রামায়ণ পূর্ণত্বমুখীন হতে গিয়েও ব্যর্থ। তা-ই মহাভারতে পূর্ণত্বপ্রাপ্ত। মানবজীবন তথা সমাজের বিকশিত হওয়ার নিয়মটিই তাতে শিল্পশৈলিতায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত জীবন বিকাশ আর জীবনবিরুদ্ধ শক্তিকেই এখানে পাণ্ডব ও কৌরব রূপে মেরুকৃত করা হয়েছে। তারপর দেখানো হয় শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ অধিষ্ঠিত চেতনার সাহচর্যে পাণ্ডব অর্থাৎ দ্বান্দ্বিকরা কোন প্রযুক্তিতে কৌরব অর্থাৎ জড়-আবদ্ধতার অপশক্তিকে কুরুক্ষেত্রের ময়দানে টেনে নিয়ে গিয়ে মীমাংসা করে। দুর্যোধন অর্থাৎ ধনরূপী আবর্জনাকে কীভাবে আর্থসমাজের বিকাশশীলতায় প্রাণবন্ত করে। এই অখণ্ড জীবনতত্ত্ব আর্থসামাজিক প্রায়োগিকতায় বাস্তবায়িত করতে না

পারার পরিণামে যুগে যুগে রক্ষণকামিতা সেই তত্ত্বকে বিকৃত খণ্ডিত খর্বিত করে তাতে হাজার হাজার ধারণার সংস্কার, কুসংস্কারের এমনি সব কুস্তি কসরতির মোচ্ছব সংক্রামিত করেছে যা থেকে আর জীবনবিকাশী শক্তি তথা প্রেরণা মানুষ আহরণ করতে পারে না। জীবনচর্চা শূন্যতায় আছট আর্থসমাজ মানসে সেই তত্ত্বের তথ্যরূপ কাহিনিগুলি হরেক ধারণার অতৈন্দ্রিক গাল গপ্প হিসেবেই সংস্কারের গড্ডালিকা হয়ে সমাজ মানসে ভেসে বেড়ায়। এই সমাজ মানস তখন ব্রহ্মতত্ত্বের সারমর্ম অনুধাবন করতে পারে না। বলেই আলকোরানিক জীবনদর্শনও তার কাছে বিজাতীয় হয়ে যায়। জীবনচর্চা শূন্য করে তত্ত্বকে তথ্য বানানোর অপশক্তি যে ব্রাহ্মণ্য বর্ণবাদের সংক্রমণ ঘটায় তাতেই ভারতীয় জীবনধারা এমন এক শীলমোহরে মোহরান্ধ হয়ে যায় যা যুগ যুগ ধরে ভারতীয় আর্থসমাজ মানবতাকে নিম্নতম পঙ্কিলতার আবর্তে নিক্ষেপ করে। আর্থসমাজ হয়ে যায় রুদ্ধ।

বৌদ্ধ দর্শন

রুদ্ধ এই আর্থসমাজের সামনে একা দাঁড়িয়ে যান গৌতম। আর্য ঋষির জ্ঞানসূত্র সম্ভূত যে জন্মাষ্টমী তত্ত্ব তার তথ্যরূপী জবড়জং ধারণার সংক্রামক ব্রাহ্মণ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ করেন। আমিত্বিক অষ্ট অনাঙ্গিক তত্ত্ব দেন। তেড়ে ফুঁড়ে ওঠে ব্রাহ্মণ্য বর্ণবাদ। শুরু করে বৌদ্ধ নিধন যজ্ঞ। দুঃখ, দুঃখের কারণ আর দুঃখের নিবারণের যে থিয়োরিতে আর্থসমাজকে প্রাণবন্ত করে তার বদ্ধতা ঘুচিয়ে দেবার সূত্রে বৈদিক দর্শনের বিচ্যুতিকে তিনি বাতিল করেছিলেন। নিধন যজ্ঞ চালাবার পরও যখন জনমানসে প্রভাব রোখা যাচ্ছিল না- তখন তাঁর অন্তর্ধানের পর তাঁকেও সেই ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের অবতার বানিয়ে তবেই ব্রাহ্মণ্যবাদের সাধ মিটে। তিনি দেহ ছাড়ার পর পরই ধীরে ধীরে বৌদ্ধ দর্শন শিষ্যাচার্যদের হাতে পড়ে একই দশায় নিমজ্জিত হল। অর্থাৎ সারবত্তাহীন অনুকৃতি আর আনুষ্ঠানিকতা। আর্থসমাজ একই তিমিরে। বৌদ্ধ নিধনের কোপে পড়ে তা বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে গেলে বহির্বিশ্ব তার ব্যবহারে তাদের কল্যাণও করে, বিকৃতিতে আত্মধ্বংসী কাণ্ডকারখানাতেও মাতে। মোট কথা অনাঙ্গিক তত্ত্বের আর্থসামাজিক তথা রাজনৈতিক প্রয়োগ না হওয়ায় তাও কালক্রমে ধর্মের জালে নিজেকে আবদ্ধ করে।

ঐতিহাসিক ইসলামের বিজয় : আলকোরানিক দর্শন

বস্তুসূত্রের একই ধারায় মধ্যপ্রাচ্যের আবদ্ধ আর্থসমাজকে আমূল নাড়িয়ে দেন রাসুলুল্লাহ (সঃ)। মক্কার এক বণিক জীবনচর্চাকে কোন স্তরে নিয়ে গিয়ে কেমন যোগ্যতা অর্জন করলে মহাবিশ্বের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান-দর্শন হাতের মুঠোয় এসে যায় মানব জাতির সামনে তার অনন্য নজির সৃষ্টি করেন। যা আবহমান কালজুড়েই মানবজাতির জন্য অনুপ্রেরণা।

দাসত্বের শ্রমসম্পর্কে আবদ্ধ খণ্ড খণ্ড গোষ্ঠী ধারণায় সংক্রামিত বর্বর একটি ভূখণ্ডের জনমানসের সামনে এমন এক ঐক্য সূত্র তিনি হাজির করলেন যার সামনে রক্ষণকামের কোনো জারিজুরি টিকল না। ইসলামের আর্থসামাজিক প্রযুক্তি বিশ্ববিপ্লব ঘটাল। কেমন এই আর্থসামাজিক প্রযুক্তি?

১। কালেমা অর্থাৎ তৌহিদ অর্থাৎ 'আমি'র অর্থাৎ চেতনার একত্ব। মানে মানব জাতির একত্ব ও তার আর্থসামাজিক প্রয়োগ।

২। সাউম অর্থাৎ দেহমনগত পরিশুদ্ধির সাংস্কৃতিক প্রযুক্তি।

৩। সলাত অর্থাৎ আমিত্ব চেতনার অধিকৃতির তত্ত্ব ও তার প্রায়োগিক নির্দেশ।

৪। জাকাত অর্থাৎ আমিত্বিক পরিশুদ্ধিতে অবাঞ্ছিত ত্যাগে আত্মশুদ্ধির তত্ত্ব যা শ্রমমূল্যের বিন্যাসবাচক বস্তু প্রযুক্তি।

৫। হজ্জ্ব অর্থাৎ বিশ্ব মানবতার মহা সম্মেলন তত্ত্ব। যাতে উৎপাদিত মূল্যের উদবৃত্তের প্রথমে কেন্দ্রীকরণ ও পরবর্তীতে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানোর নির্দেশনা।

পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান বিধান আলকোরানিক দর্শনেই দৃষ্ট থাকল না। তা যথাযথ আর্থসামাজিক প্রযুক্তিসহ আর্থসমাজে বর্তিত হল। তা হল আবুজেহেলিয়ানার অবসান ঘটিয়ে মক্কা বিজয়ের বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। মানবজাতি পেল তার জীবন বিকাশের উপজীব্য জীবনাদর্শ। অর্থাৎ ইসলাম হল পূর্ণাঙ্গ জীবনের চিরায়ত জ্ঞান-বিধান। যা ঐতিহাসিকভাবে প্রযুক্ত হল খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে।

এই দর্শন সেই জীবন বিকাশের শক্তি ও জীবনবিরুদ্ধ শক্তিকে চিহ্নিত করল যথাক্রমে ইনসান ও জ্বিন নামবাচকতায়। সমকালীন রক্ষণকামের পরাজয় ঘটল। বিজয় অর্জন করল ঐতিহাসিক মুসলিম। ইসলামের ভোগ বিধানে আর্থসমাজে শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হল। জনপদগুলি তা ভোগও করল।

পরাজিত হলেও জীবনবিরুদ্ধ শক্তিটি অর্থাৎ অসুর/ইবলিশ/জ্বিন/রক্ষ/রাক্ষস/রাবণ কিন্তু বসে থাকেনা। তার চলাচল ব্যক্তি একক থেকে সমাজ অনেকেক পর্যন্ত। তাই ৬৩০ খ্রিঃ মক্কাবিজয় ৬৩২ খ্রিঃ এর রাসুলুল্লাহের তিরধান এবং পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদিন এর শেষ অর্থাৎ হজরত আলি (সঃ) সময় ৬৬১ খ্রিঃ পর্যন্ত কালসীমা। এই ২৯ বছরে ঐতিহাসিক ইসলাম আর্থসামাজিক ভোগবিধান করল বস্তুর নিয়মেই। ঘাপটি মেরে যাওয়া রক্ষণকামিতা মাথা চাড়া দিতে দিতে একসময় ক্ষমতাও কব্জা করে নিল।

শুরু করে দিল তার অপকাণ্ড। অপকাণ্ডের মাধ্যমে জীবনের অখণ্ড বস্তুত্বকে তথ্যরূপ দিতে শুরু করল। জনজীবনে সংক্রামিত করতে থাকল আনুষ্ঠানিক জৌলুশ। ঐতিহাসিক ইসলামের বাউণ্ডারিহীন বিশ্ব-মানবতার তত্ত্ব (স্টেটলেস সোসাইটি) উল্টে ক্ষমতা ও ধনকেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র সংক্রামিত হল। আলকোরানিক তত্ত্বের বিকৃতি হিসেব হাদিস হাজির করল। এককথায় ইসলামকে কব্জা করা হল সেই একই ধর্ম কারায়। আদর্শবাচক মুসলিম সম্প্রদায় আদর্শ হারাল। যা রইল তা কেবল অনুষ্ঠান আর সংস্কার।

এই অনুষ্ঠানী ইসলাম ইরানে আরও একবার সুফিবাদ সংক্রমণীতে ভর করে উপমহাদেশে এসে হাজির হল দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে। যা সেন্টিমেন্ট্যাল ধারণা আর অনুষ্ঠানরূপী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পরগাছা ব্রাহ্মণ্যবাদের সংক্রমণে ভারতীয় জনমানসের দশা ইতিপূর্বেই এমন প্রতিবন্ধকতায় পৌঁছেছিল যাতে ভৌগোলিক বাউণ্ডারি পাহারাদারিতেও তারা বার বার ব্যর্থ হয়েছে। সেই ব্যর্থতাতেই দ্বাদশ শতকে দাস বংশের উত্থান হল দিল্লিতে।

জীবন বিকাশের উপজীব্য বস্তুর বিধানহীন এই সব ধর্ম নামীয় জবড়জং ধারণার জঙ্গল প্রত্যক্ষ করেই ব্রিটিশ ক্ষমতা পরবর্তীতে এখানে জাঁকিয়ে বসে। ব্রিটিশ ক্ষমতা দেখে নিয়েছিল সংক্রামিত ধারণার জঙ্গলের অনৈক্য। সেই অনৈক্য ভাঙিয়েই তারা এদেশে ২০০ বছরেরও বেশি শাসন-শোষণ জুলুম অব্যহত রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

মার্কসীয় দর্শন

আলকোরানিক দর্শন তথা ইসলামের আর্থসামাজিক প্রযুক্তি অকেজো হয়ে যাবার হাজার বছরেরও বেশি পরে ইউরোপে বস্তু সন্ধানী গবেষণার পরিণতিতেই মার্কসীয় দর্শনের উদবৃত্ত মূল্যতত্ত্ব। সেই মূল্যতত্ত্বের বাস্তবায়নের ভিত্তি হিসেবে চেতনাকেই গ্রহণ করা হয়েছিল। ফ্রয়েডীয় চেতনা বিশ্লেষণের কনসাস, সাবকনসাস ও আনকনসাস বিভাজনকে অস্বীকার করে মার্কস বললেন মানুষকে সচেতন হতে হবে। এই সচেতনায় সেই উদবৃত্ত মূল্য আর্থসামাজিকীকরণ করতে হয়। Theory of Negation of Negation তত্ত্বে। যে তত্ত্বে মানবজাতি তার জীবনমুক্তির পথ পরিক্রমায় লেনিনীয় বাস্তবায়নে বিজয় অর্জন করল। জীবনভোগও করল। ধর্মরূপী বিভিন্ন সেক্টারিয়ান রক্ষণকামী ব্লক তাকে যতই নাস্তিক্য তকমায় গালাগাল করুক। ইতিহাস কি তাতে ম্লান হয়, না মানুষ জীবনভোগে বিরত থাকে? থাকে না। মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিতেই প্রায়োগিক শিল্পসাহিত্যের সাফল্য জীবনচর্চার বস্তুগত সেই একই ধারাকেই সাফল্যমণ্ডিত করল। রক্ষণকামিতা ঠাণ্ডা যুদ্ধের ছক্কাপাঞ্জায় ও আমিত্ব কর্ষণহীন ক্লান্তিতে পড়ে যাওয়া সোভিয়েত নেতৃত্ব তার শক্তি হারাল। নব্বই এর দশকে তাকে হারিয়ে রক্ষণকামিতা পুনরায় তার রাক্ষুসে থাবায় গ্রাস করল মুক্তজীবনকে। অবরুদ্ধ করল জীবন বিকাশ। মার্কসীয় দর্শনকে রক্ষণকামিতা জীবনবস্তু থেকে সরিয়ে দিতে পারলেও তাকে ধর্মে রূপ দিতে পারেনি। তাই তার প্রতিও তার আতঙ্ক দূর হল না। তাই তাতে সে Economic Determinism নিক্ষিপ্ত করে, Feminism দিয়ে আলাদা দল সাজায়। Post modernism লেলিয়ে দেয়। যে মার্কসীয় দর্শনের জড়বাদের

বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাকেই সে জড়বস্তুবাদী করে ছেড়ে দিয়েছে। আজ সারা বিশ্বে মার্কসীয় দর্শন অনুসারীরা সেই জড়বস্তুবাদের কবলে পড়ে মার্কসবাদী সাজলেও তা যে প্রকারান্তরে মার্কসীয় দর্শনের সাথে ব্ল্যাকমেইল তাতে কোনো সংশয় নেই। জীবনচার্চিক তথা বস্তুমুখীন আমিত্ব গবেষক না হলে কম্যুনিজমের বুলিও যে ধর্মের মতো সেন্টিমেন্ট্যাল আরেকটি ব্লকে পর্যবসিত হয়ে যায় তাতে আর সন্দেহ কী।

এই স্বঘোষিত মার্কসবাদীরা উদার গণতন্ত্রীদের সাথে ভিড়ে গিয়ে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে যেভাবে মুক্তবাজার অর্থনীতিকে ভ্যালিডিয়েশন দিয়েছে তা ইতিহাসের ছাত্ররা একটু নড়ে চড়ে বসলেই দেখতে পাবেন। তাঁদের সেই পাণ্ডিত্যের ভারে তারা– ১) ভারতীয় দর্শনের সারবত্তাকে মিথ বলে বাতিল করেছে। ২) আলকোরানিক দর্শনও ধর্ম হিসেবে তারা বাতিল করেছে। ৩) মার্কসীয় দর্শনকে তারা জড়বস্তুবাদে পর্যবসিত করেছে। পরিণামে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আর্থসামাজিক রক্ষণকাম তথা কর্পোরেট পুঁজি সংক্রামিত ষড়যন্ত্রকে তারা ধরতে ব্যর্থ শুধু নয়। তাতে সহযোগী হয়েছে। প্রাদেশিক ক্ষমতার ক্ষেত্রগুলিতে সেক্টারিয়ান বিভিন্ন ব্লকে সাম্প্রদায়িকতার সংক্রমণে তাদের ভূমিকাও কম নয়।

উপসংহার

যুগান্তকারী জ্ঞান-দর্শন-প্রযুক্তি ইতিহাসহীন হঠাৎ করে আকাশ থেকে পড়ে না। তা বস্তুসূত্রের একই ধারায় আর্থসমাজ সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়ে মানব জাতির কাছে ধরা দেয়। যেমন মার্কসীয় দর্শন। প্রুঁধো, ফয়েরবাখ, হেগেল প্রমুখের হাতে একটু একটু করে কাল মার্কসে এসে সমকাল জীবন মুক্তির দিশায় রূপ নেয়। তেমনি আলকোরানিক দর্শনও ইতিপূর্বের জ্ঞান-দর্শনের বস্তুগত ধারাবাহিকতাতেই প্রণীত ও প্রতিপাদিত হয়। আর আজ যখন উদবৃত্ত মূল্যতত্ত্বের আবিষ্কার ও তার সমকাল প্রয়োগের পর সারা বিশ্বের আর্থসমাজ রক্ষণকামী যাঁতাকলে ধৃত তখন 'অস্তিত্ব' এর দর্শন প্রযুক্তি বস্তুসূত্রের সেই একই ধারায় উদবৃত্ত মূল্যের কারণ তত্ত্ব নিয়ে হাজির হয়েছে। যাতে মানুষের জীবনের আগা-পাশ-তলা ঝকঝকে দর্পণে দেখা যায়। মৌমাছির মৌচাক ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণে অকেজো হয়ে গেলে, মৌমাছি নতুন মৌচাক বানিয়ে নেয়। তেমনি মৌচাক প্রযুক্তি তত্ত্বে আর্থসমাজের পুনর্গঠনের তত্ত্ব দর্শন হল 'অস্তিত্ব'। এই দর্শনের বস্তুগত প্রযুক্তিতেই মানুষ তার ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার জীবন ও মৃত্যুকে শনাক্ত করতে সক্ষম হতে পারে। গড়ে তুলতে পারে নতুন আর্থসামাজিক মৌচাক। আর তার করতে গেলে রক্ষণকামী খণ্ডত্ব উৎপাটন করতে হয়। খাণ্ডব দাহন অর্থাৎ মহাভারতীয় দর্শন প্রজ্ঞার সূত্রেই তা করা সম্ভব। সেই প্রজ্ঞারই বিধান জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রামের ত্রিশূল প্রযুক্তি। জীবনের আবদ্ধতার কারণ সন্ধান অর্থাৎ জ্ঞান যাতে জীবনকে গঠন করার প্রযুক্তি লাভ করা যায়। আর সেই জ্ঞানের শক্তিতে শক্ত হওয়া অর্থাৎ বিশ্বাস নিয়েই রক্ষণকামের বিরুদ্ধে কুরুক্ষেত্রের ময়দান অর্থাৎ আর্থসামাজিক দ্বন্দ্ব ক্ষেত্রে সংগ্রাম করেই বিজয় অর্জন করতে হয়। এই নিয়মেরই ভাষ্য ও সমকাল প্রযুক্তির উদ্ভাবক 'অস্তিত্ব' দর্শন। এই দর্শনের আর্থসামাজিক সংস্কৃতিগত রাজনৈতিক বাস্তবায়নেই সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে শুধু নয় জীবন বিরোধী অপশক্তি অর্থাৎ রক্ষণকামের কবল থেকে আর্থসমাজ মুক্ত হতে পারে।

প্রজন্ম প্রতিরোধ না জন্মনিয়ন্ত্রণ?

কিংশুক সন্ন্যাসী

বর্তমান সমাজ মনে একটা কথা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, একটা বা দুটি সন্তান নিলে তাকে ভালো করে মানুষ করা যায়, তার জন্য যে খরচ হবে, যদি ৪-৫ জন থাকে তবে তা তাদের মধ্যে বন্টিত হয়ে যাবে। পরিণামে কেউই ভালো মানুষ হতে পারবে না। আর যদি শিশু একটা হয় তবে ঝামেলা কম, তার প্রতি নজর বেশি দেওয়া যাবে, যত্ন নেওয়া যাবে, শিশুর স্বাস্থ্যসহ সকল কিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করা যাবে। তাই বিগত দুই দশক ধরে প্রচার হচ্ছে, পরিবার পরিকল্পনার নানান সুবিধাকারী বৈশিষ্ট্যের। সেই থেকে বাংলা তথা ভারতের পরিবারগুলির বাবা-মায়েরা রক্ষণকামী জন্ম নিয়ন্ত্রণী কৌশলরূপে বন্ধ্যাত্বকরণী ও নির্বীর্যকরণী উপায় অবলম্বন করেছে। ক্ষমতা প্রযোজিত সাংস্কৃতিক কর্মসূচির বিজ্ঞাপনেও তার প্রচার কার্য অব্যাহত রয়েছে। রক্ষণকামী রাক্ষুসী অপরাজনৈতিক ক্ষমতা শক্তি এরই নাম দিয়েছে ফ্যামিলি প্ল্যানিং, সুখী পরিবার।

এখন দেখার বিষয়, ভালো করে শিশু মানুষ করার জন্য এইরূপ নির্বীর্যকরণীর পরিণাম শিশুর বিকাশের সহায়ক না প্রতিবন্ধক? তার সাথে উক্ত কৌশলটিও জীবনের পথকে মুক্ত করে না পথ আগলে জীবনকে বিকৃত করে?

নিয়ন্ত্রণ কথাটির অর্থ আমাদের সবার জানা। যাকে আমরা প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে পারি কিংবা তা না করতে পারি। নিয়ন্ত্রণী কৌশল চলার স্বাভাবিকতায় কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতার সংক্রমণ না করে। ভবিষ্যত প্রজন্মের ক্ষেত্রে সেই কথাটি আনলে কি দাঁড়ায়? যে এমন একটি প্রকৌশল যেখানে আমরা প্রজন্মের স্টিয়ারিংকে হাতে রাখবো, যাতে করে জীবন নির্বাহে তাকে স্থান কাল পাত্রের নিরিখে আগামী প্রজন্মের সূচনা ঘটানো কিংবা না ঘটানোর কর্তৃত্ব থাকে। জীবনের বিকাশে কোনোরূপ বাধা কিংবা বিকৃতির জঞ্জালও না গজায়। কিন্তু যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের কথা রক্ষণকাম বলছে তাতে তো নিয়ন্ত্রণ নেই। আছে প্রজনন ক্ষমতার ছেদ বা কাট অফ। কিংবা দেহমানসিক বিকৃতির এমন কিছু কৌশল যা দেহমনের স্বাচ্ছন্দ্যকে বিনষ্ট করে। জীবনের প্রশান্তিও কেড়ে নেয়। থাকে কেবল জড় ভোগের, জড় সুখের তাৎক্ষণিকতার মাতলামি। তাহলে কি এই পদ্ধতি ও তার জনিত বিশেষণকে উপরি উক্ত নামেও অভিহিত করা যায়? না একে জীবন বিকাশক বলা চলে? না একে জীবনের বিবর্তনী কৌশলরূপে চিহ্নিত করা যায়?

এবারে দেখা যাক, শিশুর বিকাশের মধুর বাণীর সারবত্তাটি কোথাও আছে কিনা?

শিশুর বিকাশ তথা মানব বিকাশের তিনটি স্তর আছে। প্রথমস্তর হল শিশুর বাবা-মায়ের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হওয়া, যেখানে শিশুকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় স্তরে শিশুকে দাদা-দিদি, ভাই-বোনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হতে হয়। এই স্তর তার সামাজিক বিকাশের প্রথম স্তর। আর তৃতীয় স্তর হল প্রতিবেশি থেকে বিশ্বের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হওয়া।

যে পরিবারে একটি মাত্র শিশু, সে জীবনের প্রথম স্তরের পরই দ্বিতীয় স্তর না পেয়ে সরাসরি তৃতীয় স্তরে এসে পড়ে। অর্থাৎ তাদের দাদা-দিদি ও ভাই-বোন না থাকায় সেই সকল শিশু বাবা-মায়ের পরই প্রতিবেশি থেকে শুরু করে রাক্ষুসে সমাজের জঙ্গলে এসে পড়ে। শিশুর এখানেই জীবন বিকাশগত একটা বিরাট ফাঁক থেকে যায়। যার ফলে সে সামাজিক স্তরের প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়ায় মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে প্রবেশ করে। যে স্তরটি শিশুর কাছে রঙিন প্রজাপতি সম। কিন্তু যেহেতু তার কোনো ভিত্তি সে পরিবার থেকে পাইনি, তাই তখন সেই রঙিন প্রজাপতির পেছন পেছন ছুটতে গিয়ে সেই জঙ্গলের বাঘ-ভালুকের থাবায়ও বেশিরভাগ

সময়েই পড়ে যায়। সেই বাঘ-ভালুকের সাথে কেমন করে চলতে হয়, তাদের কী করে দাঁত-নখের থাবাকে শিক্ষালব্ধ শক্তি দিয়ে মোকাবিলা করতে হয় তা স্তর উল্লম্ফিত চেতনায় ধরা দেয় না। তখন জীবন থেকে পালাতে কেউ কেউ আত্মহত্যা করে, আবার কেউ কেউ বিকারগ্রস্ত চিন্তা-চেতনার জটাজালে জড়িয়ে পড়ে। কেউ আবার সেই বাঘ-ভালুকের দাঁত খিঁচুনি খেতে খেতে নিজেরাও তাদের সাথে মিশে গিয়ে অপকাণ্ডের কাণ্ডারী বনে যায়। সমাজে বাঘ-ভালুকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। আবার কেউ কেউ মেষ-ভেড়ার জীবন কাটাতে থাকে। তারা তলদেশের কারণটি অনুসন্ধান করতে পারে না। আর তাদের অভিভাবকরা বলতে থাকে, আমার ছেলে কিংবা মেয়ে এমন কাজ করতে পারে আমরা কখনোই ভাবতে পারিনি। অথবা আমার ছেলে/ মেয়েরা এদের শিকার হবে একথাও কোনোদিন ভাবিনি। আমরা কারো সাতে পাঁচে থাকি না। তাহলে আমাদের সাথে এমন কেন হল বিধাতা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এদের আরো কিছু সমস্যা দেখা যায়। এরা নিজেদের অধিকার আদায়ে ক্ষমতার কাছে কোনো প্রশ্ন খাড়া করতে পারে না। কারণ তারা দেহমানসিকভাবেও হয় শক্তিহীন। তাদের পারস্পরিক কোনো সহানুভূতি-সহমর্মিতা তথা মানবিকতার সম্পর্ক থাকে না। সমাজ চলে কেবল মাত্র ব্যক্তি স্বার্থে। শান্তশিষ্ট এই সকল কিশোর-কিশোরীদের সামনে সে তখন নানান ধরনের সেন্টিমেন্ট খাড়া করে। তাদেরকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে। কোথাও ধারণার সেন্টিমেন্ট, কোথাও ভাষা, তো কোথাও তথাকথিত ধর্ম, কাউকে আঞ্চলিকতা তো কাউকে তারই কথিত সমাজ, সংস্কৃতির মিথে ভাগ ভাগ করে ফেলে। সমাজের মধ্যে বাস করেও নিজেদের একই গ্রন্থিতে গাঁথতে পারেনা। একই সমাজে থেকে এক একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের আবর্ত খাড়া করে। যার ফলে কেন তারা চাকরি পায় না, কেন তারা সমাজে লাঞ্ছিত হয়, তার কোনো প্রকার প্রশ্নই করতে জানে না। রক্ষণকামেরও খুব ভালো হয়। শোষণ ও শাসনের ভিতকে আরো বেশি পাকাপোক্ত করে।

প্রজন্মের আগমনগত আগে পরের সাথেও শিশুর মনন ক্ষেত্রের প্রেক্ষাশক্তির তারতম্য দেখা যায়। পিতামাতার প্রথম সন্তান আসে পিতামাতার রোমান্টিকতার আবহেই। ফলে সেই সন্তানের চেতনার প্রেক্ষাও আবেগঘন হয়। দ্বিতীয় সন্তান আসে যখন, তখন বাবা-মা সংসারকে বুঝতে জানতে শুরু করেছে এমন কালে। অর্থাৎ সাংসারিক জীবনের প্রবেশ করার যুগ সন্ধিক্ষণে। তাই প্রথমের সাথে দ্বিতীয়ের চেতনা শক্তিগত পার্থক্যও ঘটে যায়। আর তৃতীয় সন্তানের সময়কালে পিতা-মাতা সংসারের হিসেব-নিকেশ আয়ত্ত্ব করে ফেলেছে এমন কালে। তাই সেই সন্তান আগের দুটির চেয়ে অপেক্ষাকৃত কেবলমাত্র আবেগময়তায় ভরা মননক্ষেত্রের শক্তিই নয়, পাশাপাশি তার অঙ্ক কষার শক্তির সঞ্চারণ পেয়ে থাকে। চেতনার শক্তি পূর্বের সন্তানের চেয়ে স্তরগত মানে উপরেই থাকে। যার ফলে প্রথম ও দ্বিতীয়ের চেয়ে পরের সন্তানগুলি জীবনের মোকাবিলায় অধিকার না পেলে, কিংবা জীবন যন্ত্রণার স্বীকার হলে হিসেব কষতে শুরু করে কেন সে বঞ্চিত হচ্ছে? কারা তাকে বঞ্চনা করছে? কীভাবেই সেই অধিকার আদায় করা যায়? কিংবা যন্ত্রণার কারণ ও সমাধানের পথ খোঁজার প্রয়াসে অন্বেষণ শুরু করে। আর তাতেই রক্ষমকাম রাবণের মাথায় বাজ পড়ে, অধিকার আদায়ের প্রশ্নের মুখে না পড়তে রক্ষণকামের জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে প্রজনন ক্ষমতার ছেদন। যাতে করে মেধা তথা জীবন দিশারি ক্রিয়েটিভ ভবিষ্যত প্রজন্মের আগমন যত দেরিতে হয়, রক্ষমকামের ততই ক্ষমতাভোগ ও সামাজিক স্রোত বহতাগত সম্পদের কব্জাকৃত দখল বজায় রাখার সয়মসীমা বাড়তে থাকে। অতএব চালাও কাঁচি ছুরি, করো ছেদন। তাতে কে বাঁচল আর কে মরল, কে পচলো আর কে পাঁকে পড়ল, তাতে কিছু আসে যায় না। আর এই ছেদনকারী কৌশলে শ্রমিকের স্বার্থও পূরণ হয় না। কেবলমাত্র পেট ভরে অপরাজনৈতিক ক্ষমতা ও তার দোসর রাক্ষুসে সামাজিক সম্পদ কুক্ষিকারদের।

তাহলে কি জীবনের ছন্দসহ সামাজিক সম্পদের তত্ত্বাবধানী পজিটিভ নেতৃত্ব ও সেই সমাজ সহায়ক ব্যক্তিবর্গের জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই? আর কোন

নিয়ন্ত্রণে শ্রমিকের স্বার্থও পূরিত হয়?

সামাজিক সম্পদের তত্ত্বাবধানী ক্ষমতা নেতৃত্বেরও জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু সেই প্রয়োজনের সীমা, সময়কাল, প্রকৌশল কেমন হবে, তা মানুষের স্বাভাবিক চিন্তা ও ভাবনার গতিপথকে উন্মুক্ত করলেই তা চেতনায় ধরা দেয়। চিন্তা-চেতনার গতিপথ মুক্ত থাকে তখনই যখন মানব শ্রমশক্তির সাথে মূল্যের যথার্থ ব্যালান্স ঘটানো যায়। শ্রমে অংশগ্রহণ, মূল্য উৎপাদন, মূল্যের বিভাজন ও বিভাজিত মূল্যের যথার্থ বিন্যাসের মাধ্যমে। কিন্তু তা ব্যক্তি শ্রমিকের এককভাবে সম্ভব নয়। কারণ তার শ্রম প্রয়োগ থেকে শুরু করে বিন্যাস এবং মূল্য বিনিময় সবটাই সামাজিকভাবে হয়। তাকে সামাজিকভাবেই এগিয়ে আসতে হয়। তারজন্য তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব-কর্তব্য হল শ্রমসৃষ্ট পূর্ণমূল্যের বিন্যাসে পুনরুৎপাদনসহ প্রয়োজনীয় মূল্য তথা আবশ্যিক মূল্য বাদে অবশিষ্ট উদবৃত্ত মূল্যের সামাজিকীকরণের মনন গঠন ও তার প্রয়োগ ঘটানো। তা না করলে সেই শ্রমিকই মূল্য কুক্ষি করতে করতে মূল্যের পাহাড় খাড়া করে ফেলে। সমাজের অন্যান্য শ্রমিকের মূল্য শোষণ করতে থাকবে। যা ভারতীয় জীবন দর্শনে লক্ষ্মী স্বরূপ থেকে গণেশ স্বরূপে চিহ্নিত। যেখানেই পেঁচার কোজাগরী সচেতনায় সরস্বতী স্বরূপে ধাবিত হলেই সংগ্রামী কার্তিকের ময়ূর কর্তৃক ঈর্ষারূপ কালীয় নাগ বধ ঘটে। আর তাতেই আর্থসামাজিক পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থায় দূর্গা স্বরূপে প্রতিভাত হয়। যে স্বরূপ দেখলেই বোঝা যায় জীবনের আরাধ্য বস্তুস্বরূপের রূপ ও সৌন্দর্য। যা প্রতিটি শ্রমিক তথা মানবের আরাধনার বস্তু অর্থাৎ শান্তি ও শান্তিভোগ। এই বিকাশশীল মননেই কল্পিত ও প্রযোজিত হয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা। যেখানে শ্রমিকের স্বার্থ তথা মানবতার স্বার্থ পূরিত হয়। রক্ষণকামী জন্ম নিরোধক জীবন বিকৃতিতে নয়।

সোজা কথায় জন্ম নিয়ন্ত্রণের কি দরকার নেই? আছেই তো। কিন্তু জন্ম নিয়ন্ত্রণ আর প্রজন্ম প্রতিরোধ এক জিনিস নয়। জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংযোগ সাধনেই তা আর্থসমাজে সুফলদায়ী হয়। কিন্তু জন্ম নিয়ন্ত্রণের কারণ হিসেবে জনবিস্ফোরণের আতঙ্কতত্ত্ব জ্ঞাপন যে আসলে পুঁজিরই আতঙ্কের বিজ্ঞাপন তাতে সন্দেহ নেই। আর চিনসহ ইউরোপের বহুদেশ জনসংখ্যা নীতির বর্তমান স্বরূপের দিকে তাকালে অস্তিত্ব এর উপরোক্ত তত্ত্ব যে কতটা বাস্তবানুগ তা স্পষ্ট হয়। যে আতঙ্ক জ্ঞাপনী অপকাণ্ডে প্রজন্ম ছেদের কারণেই উক্ত দেশগুলি বৃদ্ধ মানুষে ভরে গেছে। তাদের আর্থসামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে যা চিন্তার বিষয়। তাই প্রজন্ম প্রতিরোধের রক্ষণকামী অপকাণ্ড এদেশের দোসররা চাপাতে চাইলে প্রকৃতি তার হিসেব নিতে ছাড়বে না। তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কালচার

মিনারুল হক

আর্থসমাজে নানান ঘটনা ঘটে চলেছে। শ্রমিক শ্রম দিচ্ছে কিন্তু তার প্রাপ্ত মূল্যে জীবন নির্বাহ করা যাচ্ছে না। সামাজিক সম্পদ সামান্য কিছু ব্যক্তির কাছে জমা হয়ে গেছে। সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক গতি নেই। তবুও সমাজ তো চলছে, সেখানের মানুষের শ্রম বিনিময়, ফাটকাবাজি, মূল্যকুক্ষি থেকে যাবতীয় চলতেই আছে। সেখানের মানুষেরা নিজেদের দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা নিচ্ছে? তা জানতে হলে ব্যক্তির মনন ও তার সাথে সম্পর্কিত সমাজমনন ক্ষেত্রের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। দেখি ব্যক্তির ব্যাক ও সাইড গ্রাউণ্ডের তলাটা কেমন।

শিক্ষা অঙ্গন

শিক্ষা অঙ্গনের পাঠক্রমটি একটু দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যায়, সেখানে কী কী রয়েছে। যে পাঠক্রমের মধ্যে কেবলমাত্র নম্বর তোলার জন্য কিছু তথ্যের সমাবেশ ঘটানো ছাড়া আর কিছুই নেই। ছাত্রদের তেমন কিছুই তলিয়ে দেখতে হয় না। শুধু তথ্য মুখস্থ ছাড়া আর কিছু নেই। ক্লাস ওয়ান থেকে স্নাতকোত্তর স্তর অবধি কেবল নোট আর নোট মুখস্থ। ছাত্ররা সিলেবাসের বাইরের বিষয় জানা তো দূরের কথা, সিলেবাসটুকুই খতিয়ে দেখে না। যদি সিলেবাস বাদ রেখে সাহিত্যের কোনো ছাত্রকে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের কটি উপন্যাস পড়েছে, উত্তর পাবেন, একটাও নয়। শরৎ, নজরুল, সুকুমার এদের সিলেবাসে রাখাই হয় না। শিক্ষকের অবস্থাও তথৈবচ। মূল্যায়নেও যত পারো নম্বর দাও। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কও যান্ত্রিক। ছাত্রের আড়ালে শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন কুৎসিত মন্তব্য করে। ছাত্র-ছাত্রীরাও শিক্ষকের আড়ালে একই কাজ করে। ফলে ক্লাসরুমের মধ্যে কোনো রকমে উভয়েই একটা মুখোশ পরে ক্লাস শেষ করে। ক্লাস শেষে মুখোশ খুলে মুখ বেরিয়ে আসে। সেখানে শ্লীল-অশ্লীলের কোনো ভেদাভেদ থাকে না। লাইব্রেরিগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায় কেমন ভাবে ধুঁকছে। শুধুই আমরা তাৎক্ষণিকতার শটকার্টে মনোনিবেশ করছি। যার ফলে সংস্কৃতি কী তা আমরা জানি না, জানি যে রবীন্দ্রনাথের জন্ম দিবসে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা, রবীন্দ্র সংগীত গাওয়া, তাঁর নাটক করা, সুন্দর সুন্দর পোশাক ও সাজ সজ্জার মোড়কে রবীন্দ্রনাথকে সাজানো। যে গান, নাটক, উপন্যাস তথা যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির প্রেরণা লুকিয়ে আছে তার সামান্যটুকুও আমরা আমাদের জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত করি না। জীবনের সাথে তার কোথাও কোনো যোগ আছে কিনা একবারের জন্য ভাবি না। ভাবি সেই গান, কবিতা, নাটকের সাজ সজ্জা নিয়ে। যে মোড়কে তাকে আমরা বেঁধে ফেলে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে, জড়ের বাঁধনে আটকে ফেলেছি। আর তাকে করেছি দেবতার আসনে আসীন। তাই তো তার গান নিয়ে অশ্লীলতার প্রকাশ করতে আমাদের মনে কোনো দাগ কাটে না। আর যারা খুব চিৎকার করছে তারাও সেই অনুকারকেরই অনুসারি। আমাদের ভিতরের রূপটি প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে তাতেই তাদের আপত্তি। চিকন কালচারে ঘা লাগছে। মুখটা বুঝি বেরিয়ে গেল। তাই তো গেল, গেল রব।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটি বর্তমান শিক্ষাঙ্গনে কেমন, তা একটু বিশদেই আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রত্যেকটি কলেজ থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটির শিক্ষক এক্ষেত্রে একই সারিতে অবস্থান করছে। কলেজে এখন প্রাক্টিক্যাল কর্মসূচি যোগ করা হয়েছে। সেখানে ২০ শতাংশ নম্বর রাখা হয়েছে। এই নম্বরের জন্য শিক্ষক চান ছাত্রদের প্রশংসাসহ সম্পূর্ণ আনুগত্য। ছাত্ররাও সেখানে সেই নম্বরের জন্য শিক্ষকের ন্যাওটা। কলেজ পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা তো আরো ফরসা। সেখানের নম্বর ও পিএইচডির মত কোর্সের জন্য চলে আনুগত্য প্রকাশের প্রতিযোগিতা। তার সাথে রয়েছে যৌনতার বেল্যালাপনা। ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই গিভ

এ্যাণ্ড টেক পলিসিতে বিশ্বাসী। যেখানে যৌনতাও পণ্যরূপে শিক্ষার ডিগ্রি গ্রহণে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং পরস্পর তাতে তৃপ্ত। কারো কোনো অভিযোগ নেই। এই শিক্ষক ও ছাত্রদের থেকে কী আশা করা যায় সমাজজীবনে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে বর্তমানে আরো কিছু পরগাছার জন্ম হয়েছে, যারা শিক্ষার সাথেও যুক্ত নয়, যাদের তেমন কোনো ভূমিকাও শিক্ষাঙ্গনে দেখা যায় না। এরা প্রাক্তন ছাত্র। কখনো পরিচালন সমিতির পাশে ঘুরঘুর করা লোক। তারা শিক্ষকদের সাথে মিলে পরগাছার মত চলতে থাকে। এরাও সেখানে কিছু বিকৃত কর্মকাণ্ডের সমাবেশ ঘটায়। বর্তমান সমাজকে অস্বীকার করে, আরেক বিকৃতকামনার মাধ্যমে। বিকৃতিকে অস্বীকার করা কি বিকৃতি দিয়ে হয়? কখনোই হয় না। তা করতে গেলে সৃষ্টির নান্দনিক শৈলিতে করতে হয়।

পারিবারিক অঙ্গন

প্রতিটি ব্যক্তিই কোনও না কোনও পরিবারের সদস্য। পরিবার থেকে তাদের সমাজে প্রবেশ। কিন্তু সেই পরিবারগুলির তলাটা কেমন। তাদের ছেলে-মেয়েরা কোন ভাবনার স্তরে ঢুকে পড়েছে, তা তারা তলিয়ে দেখে কি? পরিবারগুলি মেতেছে জড়ের টানেই। পারস্পরিক জড় প্রতিযোগিতায়। পাশের বাড়ির মেয়েটি আজ কত দামের পোশাক পরেছে, কেমন দামের গাড়ি চড়ছে, কেমন দামের বাড়ি গড়ছে- প্রভৃতির প্রতিযোগিতায় মেতে নিজেদের সন্তানদেরও তেমনভাবে গড়ার কুস্তিতে মেতেছে। তাদের জীবন নির্বাহ কোথা থেকে হয়, জীবিকার উৎস কী? সেটা বড় নয়, যে কোনো উপায়ে অর্থ আনাটাই আজকের দিনের জীবিকার সংজ্ঞা রূপ নিয়েছে। তা সে দুনম্বরি, পাঁচ নম্বরি যেভাবেই হোক না কেন, তা পরিবারের জড়বস্তু সামগ্রীর সমাহারে ব্যবহৃত হলেই হল। তাতে কিছুই যায় আসে না।

সেই পরিবারের মা-বাবা, ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কটি কেমন, তা সেই জড়বস্তু প্রদানকারীরূপেই নিহিত। সেখানেও জড়সম্পর্ক, জড়দায়িত্ব। সেখানের ভাষাতেও নেই কোনো মার্জিত রূপ। অন্য পরিবারে কী কী খারাপ আছে, অন্য পরিবারগুলি কোন কোন অবদমিত সম্পর্কে সম্পর্কিত, অন্যদের সমস্ত মন্দ কাজগুলিই পরিবারের আলোচ্য বিষয়বস্তু হয়ে যাচ্ছে। নিজের তলাটা তারা একবারও দেখছে না। সেই তলায় যারা আশ্রিত, তাদের এই আলাপচারিতা বিশ্লেষণ যে তাদের ছেলে-মেয়েদের সংক্রামিত করতে পারে, তা কখনোই ভাবে না। ভাবে যখন নিজ সন্তান কোনো অপকর্ম করে বসে তখন তাদের অপকাণ্ড ঢাকার জন্য যা খুশি করে। ঢাকো ঢাকো তাঁদের চিকন মুখোশের আড়ালের বিকৃত রূপ যেন সমাজে প্রকাশিত না হয়। ছলাকলার আশ্রয় নেয়। তারজন্য প্রশাসন, ক্ষমতা সাথে আপোষ করো, ঘুষ দাও, কিন্তু যেভাবেই হোক মুখটি যেন রক্ষা পায়, মুখ যেন বেরিয়ে না আসে মুখোশটিই যেন চকচকে, ঝকঝকে থাকে। নিজের ছেলে মেয়ের মনের খোঁজ রাখে না, রাখতে চাই না। কখনো কি কোনো অভিভাবক নিজেদের ছেলে মেয়েদের ঐ সকল অপরাধকে অপরাধ বলে মনে করে না। তাদের সেই অপরাধের জন্য সমাজ প্রদত্ত শাস্তি পাওয়া দরকার, যাতে করে সে আর সে কোনো ধরনের অপকাজে যুক্ত না হয়। আগে তো প্রতিবাদ দরকার অভিভাবক থেকেই। তবেই তো হবে পারিবারিক কালচার। কিন্তু সমাজে তেমন পরিবারের দেখা মেলা ভার। যেখানে অন্যায় অন্যায়, খারাপ কে খারাপ, অপকর্মকে অপকর্ম, অশ্লীলকে অশ্লীল বলার মননের চর্চা রয়েছে। না তা নেই। আছে তাদের দামি স্কুল, প্রতিটি সাবজেক্ট টিউটর, দামি পোশাকের মোড়ক, দামি অলঙ্কার প্রভৃতি। এই হল আমাদের পারিবারিক কালচার। এটাকে কি কালচার বলা চলে? নাকি চিকন কালচারের আড়ালেই চলে অপসংস্কৃতির প্রতিযোগিতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষের সংক্রমণ।

আরও একটি বিষয়। পরিবার কালচারড কিনা তা বোঝা যায় তাদের পেশা বা জীবিকা থেকে প্রাপ্ত আয়ের উৎস থেকে। যদি সেই বৃত্তি কেবলমাত্র টাকাকেই প্রাধান্য দেয়, তবে তা কোনো সহজ সরল ভাবে হয় না। বিভিন্ন আঁকাবাঁকা জটিল পথেই চলে যায়। জীবনটাও জটিল হয়। পরিবারের সদস্যদের মধের সম্পর্কগুলিতে জট পড়ে। তখন জড়ই মুখ্য হয়ে

যায়। জীবনে লড়াই না করে আপোষ ও অসততার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। দাম্পত্যসঙ্গীসহ অন্যান্যরাও তাতে সংক্রামিত হয়। সেখানে একজন অন্যজনের উপর দমন, পীড়ন করতে থাকে। পারস্পরিক নির্ভরতা ও দায়-দায়িত্বের সম্পর্ক হয় না। দায়-দোষারোপের টানাটানিতে চলতে থাকে। পরিবারের এইরূপ অঙ্গনকে কি কালচার নামে অভিহিত করা যায়?

বিনোদন অঙ্গন

বিনোদেনর মধ্যে প্রথমেই আসে সিনেমার কথা। সিনেমাগুলির প্রথমেই দেখা যাচ্ছে যে নায়ক বিশাল বাড়িতে অবস্থান করছে, গাড়ি ব্যবহার করছে, সবই চিকন জড় সামগ্রীর সমাহার আর সস্তা প্রেমের কাহিনী। যেখানে না আছে তার জীবিকার প্রসঙ্গ, না আছে তার বিকাশগত স্তর। ভাষার ব্যবহারও খুবই নিম্নমানের, স্থূল রস প্রভৃতি। যেখান থেকে আর্থসমাজ জীবনের কোনো প্রতিফলন দেখা যায় না। দেখে মনেই হয় না যে জীবন ও জগতে কোনো সমস্যা আছে। সবই কষ্ট কল্পনার বিষয় হয়ে গেছে। যার থেকে মানুষ নিজেকে ও সমাজকে শনাক্তকরণের কোনো দিশা তো পাই-ই না। বরং সেখান থেকে সংক্রমণ ঘটে আরো বেশি।

সিনেমাতে নারীকে করা হয়েছে পণ্য। তার রূপ, যৌবন, দেহ প্রভৃতি বাণিজ্যের লক্ষ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে। সিনেমার ব্যাকগ্রাউন্ডে কান পাতলেই শোনা যায় যে, নায়িকাদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের যৌন চিত্রের সংলাপ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল বিকৃত চিত্রনাটগুলিকে অর্থ, প্রভাব, ক্ষমতা, বিলাস-ব্যসন দিয়ে ঢেকে রাখো, কোথাও যেন তা প্রকাশ না হয়। নায়িকা চরিত্র অভিনেতারা নিজেদের যৌনতাকে ঐ সকল কিছুর বিনিময়ে বিক্রি করে। কখনো কখনো আবার কাউকে ব্ল্যাকমেইল করতে ব্যবহারও করে থাকে। এটাই হল এই ইন্ডাস্ট্রির কালচার।

সাহিত্য জগতের অবস্থাও খুবই করুণ। সাহিত্য, গান, কবিতার মধ্যে জীবন-ছবির প্রতিফলন ঘটে চকচকে চিত্রে। সমস্যা সেখানে জড় কেন্দ্রীক। জীবনের গতি কোথায় রুদ্ধ হচ্ছে, কারা করছে, তার কোনো প্রতিফলন নেই। আছে শুধু কথার কথা। যে কথা মাটিই ছুঁতে পারে না। ফলে সাধারণের সাথে কোনো সম্পর্কও রচিত হয় না, পাঠকও নিজেদেরকে ঐ সকল গানে ও কবিতার সাথে সম্পর্কিত করতে পারে না। আসলে সম্পর্ক স্থাপনের তো কোনো সূত্রই থাকে না। যারা এই জগতের সাথে যুক্ত তারাও নিজেদেরকে সাধারণের থেকে আলাদা ভাবতে থাকে।

প্রিন্ট মিডিয়া, টি.ভি. ও সোস্যাল মিডিয়া

প্রিন্ট মিডিয়া অর্থাৎ সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতিতে নিউজ ও বর্তমান প্রেক্ষা তথা সমাজ-সংস্কৃতির যে চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে, তাতে বাস্তবতাকে আড়াল করে তার মুখ্য প্রশ্ন ভুলিয়ে দিয়ে গৌণ বিষয়গুলিকেই সমাজের সামনে মুখ্য করে তোলা হচ্ছে। সমস্যার জন্য কে দায়ী তার দিশা আমরা পাচ্ছি না। সমস্যাগুলির সঠিকভাবে পরিবেশনও করা হচ্ছে না। কাদের কে সমাধানের দায় -দায়িত্ব নিতে হয়, কীভাবে তা করা যেতে পারে তার বিন্দুমাত্র দিক নির্দেশ থাকে না। কেবলমাত্র ঘটনাগুলিকে সাজানোর চাতুরি, ঘটনার সাথে মশলা যুক্তকরা প্রভৃতিই তাদের অন্যতম কাজ। এরজন্য তারা নানান ভাবে নিজেদেরকে বিক্রি করে থাকে। তারা নিজেরাও জানে না এই বিক্রি যে তাকেও সংক্রামিত করবে।

টিভি মিডিয়ার কালচারের দিকে নজর দেওয়া যাক। টিভিতে আজকাল নিউজ রুমে বসে কিছু বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এসে কুস্তির লড়াই এ নামানো হয়। যে কুস্তাকুস্তি করতে গিয়ে তারা নিজেরাই ভুলে যায় যে কেন তা করছে। কুস্তি করার লক্ষ্য কী। ফলে সমস্যা যায় চুলোয়। আর সেখানে যুক্তির নামে সব অপযুক্তি ও আতলেমির কচকচানি চলতে থাকে। আসলে এভাবেই তারা বিষয়কে উপস্থাপন করে। উপস্থাপক কিংবা সঞ্চালকরা বিষয়গুলির চারপাশে এমনভাবে পাক ঘুরতে থাকে, যে পাকে পড়ে আমরা শ্রোতা-দর্শকও সেই আবর্তনে আবর্তিত হই। কিন্তু বিষয়বস্তুর কোনো বিষয় অন্তর ঘটে না। আরেকটা অধুনা উপসর্গ সকল মিডিয়া জুড়েই চলে এসেছে। তা হল ফেক নিউজ। তা সেই সকল মিডিয়া ম্যানদেরই নিজেদের খাড়া করা নিউজ। তারা জনমনকে এমনিভাবে মজিয়ে রাখতে চায়। নিউজের প্রযোজক ও সম্পাদকরা ক্ষমতার

দাসত্ব করতে গিয়ে মিথ্যের মুখোশে সত্যের মুখটাকে আড়াল করে সমাজের স্থিতাবস্থাকে চালিয়ে নিয়ে যায়। তারা নিজেরা ভুলে যায় তাদের দায়িত্ব হল ক্ষমতাকে প্রশ্ন করা এবং জনগণের সামনে অধিকারগুলি আদায়ে দিশা দেখানো। কিন্তু তা তারা না করে নিজেদের বিক্রি করে, মিথ্যা কিংবা সত্য-মিথ্যার কাঁচমিষ্টি কথার জাল বুনতে থাকে। যে জালের ফাঁদে পড়ে আমরাও নিজেদের লক্ষ্য ঠিক করতে না পেরে ভুল ব্যক্তিকে ম্যানডেট দিয়ে ফেলি।

আর সোস্যাল মিডিয়া তো একটা জঙ্গল। যে জঙ্গলের মধ্যে বাস করে নানান ধরনের জংলি জানোয়ার। সেখানের সুস্থতা পাওয়া তো আরো দুষ্কর। তা বিষবৃক্ষে ভরা। তার মধ্যে জীবনদায়ী বৃক্ষের খোঁজ করা মানে সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে যাওয়া বস্তুর সন্ধান করার সামিল। সেখানের ভাষা, তথ্য, ঘটনা, অপঘটন প্রভৃতির মধ্যে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল তা বের করাই অসম্ভব। আমরাও চাই শর্টকার্ট। তাতেই মেতে যায়। কিন্তু জীবনের পথের যে সরলতা তাকে পেঁচিয়ে, পেঁচিয়ে এই জগত এমন প্যাঁচের গিঁট ফেলেছে, তা ছাড়ানো খুবই কঠিন।

এবারে এই সকল ক্ষেত্রের বিজ্ঞাপন পরিবেশনের প্রেক্ষাটি দেখা যাক। বিজ্ঞাপনের ভাষাতে আছে স্থুল যৌনতার প্রকাশ, নারী ও পুরুষের দেহকে ব্যবহার। যে ব্যবহারে চিত্র পারিবারিকভাবে একসাথে দেখা যায় না। সেখানে এতটাই উলঙ্গ ও অর্ধউলঙ্গভাবে দেখানো হয়। অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রেও তারা যা নয় তাকেও মসৃণভাবে তুলে ধরছেন। সেখানে সেই পণ্যের ব্যবহারিক মূল্যের সাথে বিনিময় মূল্যের কোনো প্রকার ব্যালান্স থাক কিংবা না থাক। এরই মধ্যে আমরা বিচরণ করছি। যাতে আমরা মুখটাকে মুখোশ দিয়ে আড়াল করার প্রচার, প্রসার ও প্রযোজনায় ব্যস্ত আছি। তা জীবনকে প্রাণবন্ত করে না মুমূর্ষ করে, তা একবারও তলিয়ে দেখি না। জীবন মানে কোনো বিশেষ অংশের জীবন নয়, যারা তা করছে তাদের জীবনসহ অন্যান্যদেরও জীবন এর সাথে সম্পর্কিত।

ব্যক্তির প্রতিবেশী, বন্ধুর আড্ডার অঙ্গন

প্রতিবেশির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক আজকের দিনে ট্রেনে যাত্রা করা পাশের সহযাত্রীর সঙ্গের সম্পর্কের থেকেও খারাপ। প্রতিবেশীদের সাথে ব্যক্তি আজ পাশাপাশি থেকেও সম্পর্কগত ক্ষেত্রে বিশাল দূরে অবস্থান করে। অথবা তার কী কী খারাপ দিক আছে, কোন কোন দিকে দুর্বল প্রভৃতিকে সমাজে তুলে তাকে ছোটো করে নিজের বড়ত্ব জাহির করা। আসলে তা নিজের হীনত্বের প্রকাশ ঘটানো। সে বিপদে পড়লে তার থেকে ছলে সরে যায়। কিন্তু আবার নিজের বিপদকালে তার থেকে সহযোগিতার বাসনা রাখে। যদি প্রতিবেশীর বিপদে-আপদে না থাকে, ব্যক্তি ও তার পরিবার স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন নির্বাহ করতে পারে না। তার চোখের ঝালাসেই সে পুড়ে যেতে পারে।

ব্যক্তি ও তার বন্ধু মহলের চলাচলটি কেমন? ব্যক্তি যেহেতু জড় সুখ ও জড়বস্তু বাড়বাড়ন্ত নিয়েই তার যাবতীয় চিন্তা-চেতনা চলতে থাকে, তাই তার বন্ধুত্বও জড়বন্ধুত্ব। আর বন্ধুদের আড্ডার ভাষা ও বিষয় শুধুমাত্র স্থুল যৌনতা, কিংবা আরো বেশি টাকা, অথবা জড়সুখের কেচ্ছা-কাহিনী। তাতে পরস্পরকেও বিশ্বাস নেই। উভয়ে একসাথে চলে বটে, খাওয়া-দাওয়া করে বটে, কিন্তু মনে মনে তারা একে অপরের মনকে স্পর্শ করতে পারে না। কারণ তারা প্রত্যকেই তো জানে যে সে কতটা অপযুক্তি বা কুযুক্তির জাল বুনছে। তাতে কী করে বিশ্বাসের প্রশ্ন আসে। ব্যক্তি স্বার্থগত নিরিখে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। কারণ কোনো আদর্শ ছাড়া বন্ধুত্বও টিকতে পারে না। একই আদর্শ লক্ষ্যে কর্মসূচি ভিত্তিক যুক্ত হলেই সেখানে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সুস্থ-স্বাভাবিকতা পায়।

কর্মক্ষেত্রের প্রেক্ষাপট

কর্মক্ষেত্রে থাকে সহকর্মী ও বস কিংবা উর্দ্ধতন কর্তপক্ষ। ব্যক্তি তার কলিগদের সাথে সোস্যাল নেটওয়ার্কের বন্ধুত্বের মত হয়ে গেছে। ব্যক্তি মাথা খাটিয়ে চলে। কার সাথে চললে তার অর্থ কম খরচ হবে, কিংবা কার উপর সে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে, তার সাথেই সে চলছে। কেউ কেউ আবার সেক্টোরিয়ান ব্লক ওয়াইজও কলিগদের মধ্যে গ্রুপ করে থাকেন। কেউ কারো খাবার খাবেন, তো কারো

একেবারেই ভুলেও ছুঁয়ে দেখবেন না। আর সারাদিন শুধুই এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের পেছনে কাঠি দিতে থাকেন। পারস্পরিক সহযোগিতা না করে গিবত গাইতে থাকেন। কলিগকে কাজের ক্ষেত্রে প্রতিসঙ্গী করে তুলতে পারেন না। তবে একটা ক্ষেত্রে কিন্তু সকলেই মিলে যায়। যখন পাবলিক মানি মারার বিষয় থাকে। যখন ঘুষ নেওয়ার বিষয় থাকে। যখন ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপার থাকে। যেখানে কাজে আসতে হবে না, কিংবা কাজ থেকে আগেই চলে যেতে পারবেন, যেখানে ফাঁকি দেওয়া যাবে, সেখানে তাদের মতামত, মনোভাবে কোনো বিভেদ নেই। তারা তখন এক। কিন্তু তথাকথিত রিলিজিওন, সেন্টিমেন্ট, যুক্তি, দায়-দায়িত্বে, সহযোগিতায়, সহমর্মিতায় আলাদা হয়ে যায়। এবারে তাদের ধর্ম টা কী দাঁড়াল, পাঠক একটু ভেবে দেখুন।

ব্যক্তির মানসপট

উপরের যে সকল বিষয়গুলি আলোচনা করা হল, সেই গুলিই ব্যক্তিরই মানসক্ষেত্রের প্রেক্ষাপট। অতএব আমরা একথা বলতে পারি যে, যে মানসপটে মন্দ, কুৎসিত, নোংরা, অসততা, দূর্নীতি, অপরাধ, ফাঁকিবাজি যাবতীয় রক্ষণকামী অপশক্তির সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রণ না করলে আমাদের মনে অপঘটনা, দুর্ঘটনা, বিকৃতি জন্ম দিতে থাকবো। আর তার প্রকাশও সমাজে ঘটতে থাকবে। যার বর্ণনা আমরা উপরের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। যেখানের ব্যক্তি তার নেগেশনের তাড়না চালিত হয়ে যা কিছু করতে পারে। কিন্তু সে আবার সেই অপকর্মের অপব্যাখ্যার অজুহাত খাড়া করতেও ছাড়ে না, সেই সমাজের কাছেই। যে সমাজের অন্যান্য ইউনিটগুলিও একই কাণ্ড করে থাকে। অতএব সেখানে কে কার চুরি ধরবে। সবাই চোর। কিংবা চোরের সহযোগী অথবা নিরব সমর্থক। যে চুরিতে সে নিজেকেই ফাঁকি দিয়ে চলেছে। আর সেই চোর ধরার জন্যই লালন তার গানে বলেন, ‘ধরো চোর হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতে।’ এখন প্রশ্ন হল আমরা চোর ধরার ফাঁদ পাতবো, না নিজেরাই চোর বনে যাবো তা নির্ভর করছে, জীবনকে আমরা কীভাবে দেখছি তার উপর।

কালচারের বাস্তবতা ও বাস্তবায়ন

প্রতিটি ব্যক্তিই শ্রমিক। শ্রম দিয়ে সে মূল্য উৎপাদন করে। সেই মূল্যের থেকে তার জীবনের প্রয়োজন মেটায়। সেই প্রয়োজন মেটানোর পরও কিছু টাকা থাকে। সেই টাকা সে কী করবে এবং প্রয়োজনগুলির ছেদবিন্দুই বা কতদূর হবে তা ব্যক্তি ঠিক করবে কিনা তা নির্ভর করছে ব্যক্তির জীবনচর্চা থেকেই। যদি সে নিজেকে তথা জীবনকে আরো সুন্দর করতে চাই, তাহলে আমার প্রয়োজন কতটা তার সীমারেখা নির্ধারণ করতে পারবো। আর তার অতিরিক্ত অংশটিকে সামাজিকীকরণ করতেও পারবো। অথাৎ বিকাশশীল মনন সংজ্ঞায়িত হয় আবশ্যিক ও উদবৃত্তের বিভাজন এবং বিভাজিত মূল্যের বাস্তবায়ন কর্মসূচির দ্বারা। যে কর্মসূচিতে সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক ছন্দ পায়, জীবনের সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে তার সমাধানের পথ দিশা নির্মাণ করে আপেক্ষিকভাবে। এরই নাম হল কালচার। যারা এটা করতে পারেন তারাই হলেন কালচারড।

আর যারা তা না করে ঐ শ্রমমূল্যের সমস্তটাই তার বলে দখল করে। সেই মানসকামনা হল রক্ষণাত্মক মানস। যে মানস সেই অর্থ কেন্দ্রীক ভাবনায় ডুবে গিয়ে মনের তথা আমিত্বের বিকাশের পথটাতে বাধা দেয়। জীবনের স্বাভাবিক সহজ-সরল পথটি তখন নানান দিকে বিভক্ত হয়ে যায়। বিভক্তিকরণেই তাকে মুখ ঢাকতে মুখোশ পরতে হয়। সেখানে তার একমাথা থাকে না, সে রাবণের দশমাথায় পর্যবসিত হয় কিংবা তার সহকারী হয়ে তারই দাসত্ববৃত্তি করতে থাকে। যে দশ মাথায় দশ রকমের লক্ষ্যহীন লক্ষ্যে ঘুরতে থাকে। আর লক্ষ্যহীনতার পিছনে হরেক রকম অপযুক্তি, কুযুক্তির ছল-ছাতুরিতে পড়ে যায়। কিন্তু সেই-ই আবার সমাজের গণ্যমান্য, বিশিষ্ট ব্যক্তি রূপে দাঁড়িয়ে যায়। এটাই হল তার চিকন কালচার।

গল্প

চঁন্দ্রবিন্দু – একটি না দেখা দেশ

তানিয়া খাতুন

-নাম কী? বয়স কত?

-মন্টু সাহা। বয়স ৫৪।

-মৃত্যুর কারণ?

-আজ্ঞে, বদহজম।

-কীহ্ ?

-হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। বদহজমের কারণেই মারা গেছি।

-ইস, কী কারণের ছিরি! মৃত্যুও তোর কাছে যেতে নিশ্চয় লজ্জা পেয়েছে!

-আর লজ্জা দেবেন না স্যার। স্যার, কিছু মনে যদি না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

-বল।

-বলছিলাম, আপনার পরিচয়টা কী? আর আমি এখন কোথায়?

-সব জানানো হবে। আমার কাজ এতটুকুই ছিল। আমরা ভূতরা নিজের কাজটুকু গুছিয়ে করতে ভালোবাসি। অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ করি না।

-মানে? আপনি ভূত? আমি ভূতকে ভীষণ ভয় পাই।

-শুধু আমি না। তুইও এখন থেকে ভূত। আমাদের লিস্টে তোর নাম একটু আগেই নথিভুক্ত করলাম।

-রাম-রাম-রাম-রাম

-হা-হা-হা-হি-হি-হি, ভূতের মুখে রাম নাম!

(বিশ্বাস ভূতের প্রবেশ)

বিশ্বাস ভূত: এই যে মন্টু ভূত! চল আমার সাথে, এখন থেকে তুই আমার সাথে থাকবি। আমার কাজ হচ্ছে, তোকে বিশ্বাস করানো যে, তুই এখন ভূত! তাই আমার নাম 'বিশ্বাস ভূত'।

মন্টু ভূত: বুঝলাম। কিন্তু এতো তুই-তোকারি কেন? মরেও কি একটু সম্মান পাবো না!

বিশ্বাস ভূত: ভূতরা বড়ো ছোট সকলকেই তুই সম্বোধন করে। আর কথা বাড়াস না, আয় আমার কাঁধে উঠে বস। তোকে দেশটা ঘুরিয়ে আনি।

মন্টু ভূত: কাঁধে বসব মানে? ওরম লিকলিকে লম্বা তুই, আমাকে ফেলে দিবি তো।

বিশ্বাস ভূত: উফ্, খুব জ্বালাস তো দেখছি! শোন, এ দেশে যে যত লম্বা আর লিকলিকে তার তত ভালো। এয়ার ফোর্সে চাকরিটা তাদের হয়। কখনও দেখেছিলি, বেঁটে, ভুড়িওয়ালা আর্মি?

মন্টু ভূত: ঠিক আছে! তাহলে বসছি।

বিশ্বাস ভূত: শুনলাম তো, বদ হজমে মারা গেছিস। তারপরেও বিশ্বাস করে কাঁধে বসালাম, প্রতারণা করিস না কিন্তু।

মন্টু ভূত: না-না। আমি তো 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' এর অ্যাক্টিভ মেম্বার ছিলাম।

বিশ্বাস ভূত: তাই বলি! ঐ আবর্জনা গিলেই তোর এই বদহজম। আর আমাকে দেখ, মাত্র ১৭ বছরের স্মৃতি নিয়ে এখানে চলে এলাম। অনাহারে অনিদ্রায় বন্দি ছিলাম। জীবনটা থমকে গেছিল। এখানে এসে তবু একটা কাজ করছি, এটাই যা শান্তি।

মন্টু ভূত: তোমার দেশের নাম কী ছিল?

বিশ্বাস ভূত: আসাম রে, আসাম। তা তোর মুখে তো রাম নাম শুনছিলাম। 'জয় শ্রীরাম' বলে চেঁচাতে পারিস।

মন্টু ভূত: মিথ্যে বলব না। এক আধবার ও জীবনে চেঁচিয়েছি। পাড়ার ছেলেপিলেগুলো যখন চিৎকার করত তখন আমারও ইচ্ছে হত বৈকি।

বিশ্বাস ভূত: তা বেশ তো, এখানেও চেঁচা না। তুই চিৎকার করলে বা না করলেও কেউ তোকে পাত্তাই দেবে না। এটা শুধুমাত্র ভূতের দেশ, এখানে সবভূত সমান, এখানকার ভূতদের ভূতাবিকতা আছে।

মন্টু ভূত: কেউ যখন পাত্তাই দেবে না, তখন চেঁচিয়ে কী লাভ। তা আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?

বিশ্বাস ভূত: ফুলপাড়া।
ফুলপাড়ায় প্রবেশ-
বিশ্বাস ভূত: আশা করি বিশ্বাস করছিস যে তুই ভূত?
মন্টু ভূত: হ্যাঁ। বিশ্বাস না করে উপায় দেখছি না।
বিশ্বাস ভূত: শোন, এখন আমি চললাম। তুই ফুলভূতদের সাথে থাক। এখান থেকে অন্যপাড়ায় যেতে চাইলে ফুলভূত তোকে দিয়ে আসবে।
মন্টু ভূত: কিন্তু এরা তো দেখছি সবাই বাচ্ছা ভূত!
বিশ্বাস ভূত: হ্যাঁ, তাই এ পাড়ার নাম ফুলপাড়া। চলি রে।
একটি ফুল ভূতের প্রবেশ
ফুলভূত: এই যে নতুন ভূত, তুই কাঁদবি না তো?
মন্টু ভূত: কাঁদবো কেন?
ফুলভূত: এখানে এসে বেশিরভাগ ভূতই কাঁদে। তখন আমরা সকলে মিলে তাকে কাতুকুতু দিই, ডিগবাজি খেলে দেখায়, বড়-বড় গাছের মগডালে বেড়াতে নিয়ে যায়। তারপর হাসে।
মন্টু ভূত: এখানে কোন ভূত বেশি আসে?
ফুল ভূত: সবাই-ই আসে। তবে আত্মহত্যা পাড়া, খুনি পাড়া আর নেতা পাড়ার ভূতরা এসে বেশি কাঁদে।
মন্টু ভূত: ও বাবা! এরকম পাড়া হয় নাকি? আমি তো শুনেছি, পালপাড়া, পাঝরা পাড়া, মাস্টারপাড়া, উকিলপাড়া, ঘোষপাড়া ইত্যাদি।
ফুলভূত: এখানে ভূতদের প্রকৃতি অনুযায়ী পাড়া ভাগ করা হয়।
মন্টু ভূত: তোদের ভয় করে না? সব বাচ্চারা একা থাকিস?
ফুলভূত: অনেকে আছি আমরা। এই তো কালকেই ডাস্টবিন থেকে একজন আর একজন মায়ের পেট থেকেই এখানে এসেছে। তাছাড়া অসুখ-বিসুখ, খেতে না পেয়ে, জলে ডুবে বা ঐ অ্যাক্সিডেন্টে অনেকেই আসে ফুলপাড়ায়।
মন্টু ভূত: আমি একটু আত্মহত্যা পাড়ায় যেতে চাইছিলাম।
ফুল ভূত: আমি তো ছোটো। তাই তুই আমাকে কাঁধে নে। আমি তোকে রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি।
মন্টু-ভূত: আমি পারব উড়তে?
ফুল ভূত: ভূত হয়ে জন্ম নিলি আর উড়তে পারবি না, তা কি হয়? একটু নীচু হ, কাঁধে চাপি।
আত্মহত্যা পাড়ায় প্রবেশ
ফুল ভূত : আমি ফিরে যায়?
মন্টুভূত: থাক না আমার সাথে। বাচ্ছা মানুষ, তোর এতো তাড়া থাকবে কেন?
ফুলভূত: আচ্ছা, থাকছি। এখানে কাকে খুঁজছিস?
মন্টুভূত: আমার প্রেমিকাকে রে! গলায় দড়ি দিয়েছিল।
ফুলভূত: গলায় দড়ি ভূততো ঐ ডান দিকটায় থাকে।
মন্টুভূত: আহ, ও তো মেয়ে, ভূত নয়, পেত্নী হবে।
ফুলভূত: এখানে সবাই ভূত। ভূতও ভূত, পেত্নীও ভূত। যারা শিক্ষিত ভূত তারা আলাদা করে মেয়ে ভূতদের চিনতে পারে। পায়ের গোঁড়ার দিকে একটা হাঁড় দেখে নাকি বোঝা যায় ছেলে-মেয়ে।
মন্টুভূত: তা, আমিতো বাপু মূর্খ মানুষ। অতো কী বুঝি? ওঁর নাম নীলিমা, নীলিমা বলে চিৎকার করলে খুঁজে পাব?
ফুলভূত: বোকা, এখানে আসার ১০ দিন পরেই নতুন নামকরণ হয়, আগের নামটা ভুলে যায়। কিছুদিন পর তোর নামও অন্য হবে।
মন্টুভূত: তা কী করে হয়? আমার বাবা-মার দেওয়া নাম আমি কিছুতেই পালটাবো না।
ফুলভূত: হি-হি-হি। ভূতরাজের সামনে গেলে এমনিই সব ভুলে যাবি।
মন্টুভূত: এখন চল কোনো শিক্ষিত ভূতের কাছে।
ফুলভূত: এই আত্মহত্যা পাড়াতেই অনেক শিক্ষিত ভূত আছে। যারা ও জীবনে বেকারত্বের জ্বালায় আত্মহত্যা করেছিল। ওদের ডাকব?
মন্টুভূত: নাহ, এরাতো সবাই মরার আগেই মরে গেছিল। এরা নীলিমাকে খুঁজতে পারবে না। চল, তুই-আমি গিয়ে ঐ ডানদিকটায় দেখি।
কিছুক্ষণ খোঁজার পর-
ফুলভূত: সামনেই একটা বয়স্ক পাড়া আছে, যাবি ওখানে? ওরা যদি কিছু বলতে পারে!
মন্টুভূত: চল যায়।
বয়স্ক পাড়ায় প্রবেশ-
একজন বয়স্কভূত এগিয়ে এলো-

-কী চাই এখানে?
মন্টুভূত: ঐ আত্মহত্যা পাড়ায় থাকে নীলিমাকে চেনেন?
বয়স্কভূত: কীরে ফুলভূত? এ কি নতুন নাকি?
ফুলভূত: হ্যাঁ। আজই এসেছে।
বয়স্কভূত: ও...আচ্ছা। তুমিই তাহলে সেই বদহজমে...।
মন্টুভূত: হ্যাঁ, ঠিকই-ঠিকই।
বয়স্কভূত: শোন, এখানে সবাই ভূত। আমরা সবাই সমান।
মন্টুভূত: আচ্ছা, এ পাড়ায় কি কিশোর কুমার, মান্না দে ইনারাও থাকেন?
বয়স্কভূত: বুড়ো হলেই থাকবে। আলাদা করে চিনি না।
মন্টুভূত: সে কি? কিশোর কুমারকে চেনেন না?
বয়স্কভূত: এ কে রে ! বলছি সব ভূত একই। যা তো, এখন আমি হাঁটুর হাড়টাই সেঁক দেব। বড্ডো ব্যাথা।
মন্টুভূত: কীসে সেঁক দেবেন? ভূত তো আগুনে ভয় পায়।
বয়স্কভূত: ঐ কালী শ্মশানের গরম ছাই এনেছি, ওতেই দেব।
ফুলভূত: আমি কি সেঁক দিয়ে দেব?
বয়স্কভূত: হাসি পেল রে! ভূতদের ভূতাবিকতা বেঁচে আছে দেখে। মানুষদের কথা মাঝে মধ্যে ভাবি। মানবিকতা নেই। স্বার্থপর। ভেতরে এক বাইরে এক। আমরা ভূতরাই ভালো। যা আছে তা স্পষ্ট, ঠকাই না, হাসি-কান্না ছাড়া আবেগ নেই আমাদের, কিন্তু মানুষকে দেখ, সব আবেগ আছে কিন্তু তার সঠিক প্রয়োগ নেই।
ফুলভূত: ওসব ভাবিস না, হাঁটুটাই সেঁক দে। নয়তো সামনের অমাবস্যায় নাচতে পারবি না।
মন্টুভূত: (বয়স্কভূতের উদ্দেশ্যে) মানুষ কিন্তু অতোটাও খারাপ না। হিংসাটা একটু কমালে ওরাও ভালো।
বয়স্কভূত: হ্যাঁ, এখনও নয়দিন মানুষের গান গাইবি জানি। ১১ দিন থেকে ভূতের গানই গাইতে হবে কিন্তু।
মন্টুভূত: ভূতরা এক একটা পাড়ায় থাকছে দেখছি। কিন্তু কেউ কোনো কাজ তো করছে না। এভাবে বাঁচা যায়?
বয়স্কভূত: ও জীবনে তো কাজ করার সুযোগ ছিল। করেছিলি? করলে তো আর বদহজমে মরতে হতো না?
মন্টুভূত: ফুলভূতটার সামনে এভাবে না বললেই কী নয়?
বয়স্কভূত: ও বাবা। অপমানবোধ এখনও কাজ করছে দেখছি। শোন, এখানে ভূতরা নিজের পছন্দমতো কাজ করে। ইচ্ছে হলে করে, না হলে না করে। ভূতদের তো আর খিদে-তৃষ্ণা নেই। অমাবস্যায় সবার একসাথে নাচটাই আমাদের খাবার।
মন্টুভূত: এভাবে তো ভূতসংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকবে।
বয়স্কভূত: হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছিস। বর্তমান-ভবিষ্যৎহীন শুধুমাত্র ভূতের রাজত্ব হবে।
ফুলভূত: যা ওকে ভূতরাজের কাছে নিয়ে যা, ওর নামকরণ, বাসস্থান ঠিক করা বড্ড জরুরি দেখছি।
মন্টুভূত: বলছি, এদেশ কী স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত?
ফুলভূত: হি-হি-হি। না রে পাগল, ভূতরাজের ভূততন্ত্র দ্বারা পরিচালিত।
মন্টুভূত ফুলভূতকে কাঁধে নিয়ে ভূতরাজের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। মন্টুভূত ভাবছে, কোন পাড়ায় সে থাকবে? ওহ এতো ভাবার তো কারণ নেই, সব ভূতই সমান। তবে ফুলভূত পাড়ায় থাকলে একটু হাসি-কান্না মিশিয়ে থাকতে পেত এই যা !

অনুসন্ধান

সুকৃতি

সেই কোন সকালে সোনালীর মাথায় একটা সুন্দর প্লট এসেছিল.... ডিনারের আগেই বেশ একটি নদির স্রোতের মত নির্দিষ্ট দিকে ধীরগতিতে বয়ে চলা- এরকম একটা গল্প মনে মনে তৈরি। যতক্ষণ না লেখা হচ্ছে চিন্তার শেষ হচ্ছে না। এদিকে নিশ্চিন্তে বসবারই কি ছাই জো আছে.. শ্বশুরবাড়ির লোকের ফরমাসের অন্ত নেই। রাত্রিবেলা বেশ পরিপাটি হয়ে টেবিলটা ঝেড়েমুছে সে লিখতে বসলো। বিষয়বস্তু একই রেখে, গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বেশ আকর্ষণীয় রাখতেই হবে। লেখা শেষ হল, তবে গল্পটা যেন ঠিকঠাক হল না। সোনালী বিরক্ত হয়ে খাতাপত্রগুলো ধপধপ করে টেবিলের উপরের বইয়ের সারির উপর রাখতেই, সমস্ত বইগুলি ধপাস করে ছিটিয়ে পড়ল।

'ধুর' গতসংখ্যার কবিতাটা আমার নিজেরই খুব ভালো লেগেছিল, প্রশংসাসূচক দু-দুটো চিঠিও পেয়েছি। থাক আজ, কাল ঠিক দাঁড় করিয়ে ফেলব। কলেজও যেতে হবে !

পত্রিকাটা হল 'অনুসন্ধান'। সম্পাদক সোনালীর বর মহিম। মূলত অর্থনৈতিক কারণেই ডুবে যেতে বসেছিল পত্রিকাটা। চার মাস মত হল, সমস্ত দায়ভার নিজের কাঁধে নিয়ে মহিম এই পত্রিকার কর্ণধার।

যাই হোক, এবার তো মহিমবাবু, নতুন সংগঠনের গোটা বিশ-পঁচিশেক ছেলে আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। বেশ কিছু জনের মধ্যে লেখা নিয়ে প্রায় প্রতিযোগিতার মতই একটি ভাব তৈরি হচ্ছে ধীরে ধীরে। অনুশীলন থেকেই ঠিক লেখা বেরিয়ে আসবে। চলাফেরায় কথাবার্তায় লেখা লেখির কথাটা প্রায়ই উঠে আসছে।

সেদিন কলেজে ফিলোজফির ক্লাসে লেকচার চলছে।

সুজয় হঠাৎ বলে উঠলো- এর ঘ্যান ঘ্যানানি আর কত দিন রে? আর নেওয়া যাচ্ছে না। সেকেন্ড ইয়ারের তিন মাস মত হল নারে?

রাকেশ- দেখ না, নিজের মোবাইলটি, বেশি কথা বলিস নাতো?

সোনালী- বাব্বা, কত মনোযোগ ছেলের!

রাকেশ- এমন বিদ্রুপ ভরে কথা বলিস কেন? একটু ভদ্রতা শিখতে তো দোষ নেই।

সোনালী- তাই না তাই, দর্শনের সাথে সাথে তো এখন আরেকটা সত্য অনুসন্ধান করছিস। না রে বাবু? সোনালী আরও কয়েকজন বন্ধুর সাথে মিচকি হাসিতে মেতে ওঠে।

- লেখার কথাটা, আমি আনতেই চাইনা, আয়েষার লেখা আমার ভালো লাগে, তোর লেখাটারও প্রশংসা করেছিলাম, সেটা কি মিথ্যা ছিল?

(সুজয়)- স্যার কিন্তু মাঝে মধ্যেই আড়চোখে দেখছেন।

- যাইহোক, পত্রিকার নামটা অনেকেরই মোটেও পছন্দ নয়। যে পত্রিকায় লিখছিস, সে পত্রিকার সম্পাদক ও অন্য মানুষগুলোকে একটু শ্রদ্ধা কর। আয়েষা যেহেতু 'পাঠকের কলমে' তে পত্রিকার নামের প্রশংসা করেছিল, তোর তো ভাল লাগবেই না। সোনালী ভ্রূ কোঁচকায়।

এভাবেই চলছিল। শীত অতিক্রান্ত হয়ে বসন্ত এসেছে। দখিন বাতাসে ভর করে শুকনো পাতাগুলি গাছ থেকে ঝরে ধুলোয় এদিক থেকে ওদিক কেমন একটা ছন্দে ছুটোছুটি করে, সোনালী নিজের দেহমনে সেই সুর অনুভব করে। অস্থিরতার প্রকাশ করার জায়গাটা হল লেখা। সোনালী তার লেখা সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। একদিকে স্কুলের পরীক্ষার খাতাপত্র দেখা, ওদিকে পত্রিকা প্রকাশের দিনক্ষণ এগিয়ে আসছে, মহিমের ব্যস্ততা দশগুণ বেড়ে গেছে। একটু রাতের খাবার পর একটু দ্বিধা ভরেই মহিমকে সোনালী লেখাটা দেখাতে চাইল। মহিম বললো, 'তুমি এখন ঘুমিয়ে যাও।' খুব নম্রভাবে আবারও বললো 'স্কুলের একটু কাজ আছে, পরে দেখছি লেখাটা।'

নিজের লেখার একটি সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য সোনালী অত্যন্ত চঞ্চল ছিল। কিছুটা তার রাগ হল, উল্টো দিকে মুখ করে শুয়ে পড়ল। ভাবল 'আসলে ক্লান্ত আছে তো।'

সপ্তাহ খানেক কেটে গেল। সোনালীর সেই লেখার কথা মহিম পাড়লই না। সোনালী ভাবল 'কাজের চাপ খুব কিনা।'

এরই মাঝে সোনালী আরও দুচারটে গল্প-কবিতা লিখে ফেলেছে। রবিবার, আজ সোনালী সকাল থেকে খুব আনন্দে আছে, সাধারণ পোশাকেও ওকে খুব ঝরঝরে দেখাচ্ছে। দুপুরবেলা, সোনালী আর মহিম যখন কাছাকাছি এল, সোনালী ভেজা গলায় বললো তুমি আমার লেখাটা দেখছো না কেন?

-দেখেছি তো?

ভালো হয়নি বলেই চুপ করে আছো না?

-না, তবে আরেকবার দেখতে হবে। কে বলেছে, তুমি ভালো লেখনা। তবে ছাপার মত না হলে নিশ্চয় তোমাকে জানাবো। আর এসব এখন থাকতো। মহিম সোনালীকে কাছে টেনে নেয়।

সোনালী লিখতেই থাকে, যদি সম্ভব হতো ফুঁ দিয়েই উড়িয়ে দেওয়া যেত সবার কাছে। তবে WhatsApp তো আছে। নিজেকে প্রকাশের অদম্য ইচ্ছা এখানেই কিছুটা মেটে। শুধু, 'অনুসন্ধান' নামের সত্য অর্থ কি আর তাতে আয়েষার লেখা কতটা যুক্তি সঙ্গত ইত্যাদি সব আলোচনাগুলো থেকে না চাইলেও কিছুতেই নিজেকে সরানো যাচ্ছে না। হাজার হোক সে তো রেগুলার লেখা দেয়, তাছাড়া সম্পাদকের বউ। বন্ধুদের কত ফোন, কত মিটিং।

বাড়িতে নবীন সংগঠন-র দুজন সদস্য এসেছেন। একজন রফিক আহমেদ। সাম্প্রতিক ইস্যু নিয়ে তিনি রেগুলার প্রহসন লেখেন। আরেকজন সোনালীর সহপাঠী রহিম।

রহিম বলল- আমি চারটে লেখা পেয়েছিলাম। এই নিন।

মহিম- কিন্তু এখানে তো দুটো রে।

-দুটো লেখার কিছুই হয়নি। আমি নিজে এখনও লিখে উঠতে পারিনি, তবু ভালো পাঠক তো মানেন?

সেদিন রাতের বেলা মহিম Android সেটে কি একটা দেখছিল আর খুব হাসছিলো। সোনালী ভীষণ রেগে উঠল। শুধু লেখাপত্র লেখা আর মোবাইলে মুখ খুঁজে থাকলেই কি জীবনচর্চা হয় নাকি? মহিমের কঠিন দৃষ্টিতে সোনালী চুপ হয়ে যায়।

মহিম সোনালীর কথায় হতবাক! মোবাইল বন্ধ করে পাশ ফিরে শোয়।

কিছুক্ষণ পর।- সোনালী, কি হয়েছে তোমার? আমি কিছু বুঝতে পারছিনা? নিজেকে এত ছোট করছ?

সোনালী কাঁদতে কাঁদতে বলল- আমার লেখাটা কেমন হয়েছে, তুমি কেন কিছু বলছো না?

-এই ব্যাপার। গল্পটা ছাপাবো না, কিন্তু কবিতাটা দেব। ভালো হচ্ছে লেখা...।

তুমি মিথ্যা বলছ?

সত্যের ধারণা আছে তোমার? এই পত্রিকাই সেই লেখাই ছাপা হবে, যা সত্যের পথ দেখাবে।

জানিনা, মনে হচ্ছে তুমি বাচ্চাছেলেমিতে ক্রমশ চলে যাচ্ছো। সুজয়ের সামনে পত্রিকার নাম, অন্যদের লেখালেখি নিয়ে বিদ্রুপ এসব কী? এসবের কারণ অনুসন্ধান তুমি অবশ্যই করবে।

আরেকটা কথা বলি, তোমার লেখা ভালো। তবে আরও গভীরতা থাকা চাই। আমি জানি তুমি পারবে। মনে রেখো, লেখা যেন প্রতিযোগিতা না হয়ে ওঠে, লেখা হবে নিজের সত্যের খোঁজ ও অপরকে সে কাজে প্রেরণা দান। তার সাথে পড়াশোনাটাও কর।

সোনালী বিহুলের মত কথাগুলো গলাধঃকরণ করতে থাকে।

তাহলে কী হবে, সোনালী নিয়ম করেই লেখে মহিমকে দেখাতে থাকে। নিজেকে নিয়ে ভাবতে গেলে অন্যবিধ কাজের কথা মনে আসে। দেখতে দেখতে পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ হয়ে গেল, কিন্তু তার গল্প নেই, খুব কষ্ট হল।

চনমনে সোনালী কেমন একটা শান্ত হয়ে গেছে। কয়েকদিন থেকেই মহিম লক্ষ্য করছে, সোনালীর শরীরটা ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। কথায় সবসময় একটি খিটিমিটি ভাব...। খাতা দেখার কাজটা শেষ হলেই সোনালীর সাথে আমাকে ভালোভাবে কথা বলতে

হবে। এই ভেবে মহিম সেদিন ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন রাত দুপুর। সোনালীর পুরো দেহ কাঁপছে, ঘাম ঝরছে সারা শরীরে, কাঁদতে কাঁদতে সে জানালো ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছে।

মহিম শান্ত করার অনেক চেষ্টা করলো, কিছুতেই কিছু হলনা, হাত পা ক্রমশ শীতল হতে হতে সোনালী অজ্ঞান হয়ে বিছানায় নেতিয়ে পড়ল।

তিন সপ্তাহ সোনালী নার্সিংহোমের বেডে শুয়ে আছে। পেটে দানা পড়েনি। সোনালীর রোগশয্যা মহিমকে ক্রমাগত দুর্বল করে তুলেছিল। দিনের পর দিন রাতজাগা শরীর, ছোট ছোট চোখগুলো আরও ঢুকে গেছে।

ডাক্তারবাবুর সাথে মহিমের কথা হয়েছে, দুদিন পরে ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে। সোনালী এখন অনেকটাই সুস্থ। কথাবার্তা বলছে। মহিম যেন প্রাণ ফিরে পেল। সোনালীর বেড রেস্ট চলবে আরও একমাস।

নিজের ঘরে ফিরে সোনালী নিজেকে খুঁজে পেল। বিছানায় তার বালিশের পাশে প্রথম প্রকাশিত কবিতা আর গল্পটা ছিল। মহিম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। সোনালীর ঘুম এলোনা। টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে পেনটা নিয়ে লিখতে বসলো। তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছে। খুব সকাল তখন টেবিল ল্যাম্প জ্বলছিল... লাল রঙের কার্ডটা সহজেই চোখে পড়ল... সোনালী রাতের লেখা কবিতাটি কার্ডে সাটানো...। নীচে নীল অভ্রজলে লেখা আছে 'আমার জীবনের সেরা কবিতা।' শুকতারার মিটিমিটি হাসি আরও উজ্জ্বল হল। সোনালী উঠে পড়ল- আঁচল উড়িয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে নিজেকে বলল 'আর নয়।'

প্রেরণা

নীল

মানুষটার পুরো নামটা ঠিক মনে নেই, তবে গ্রামে সবাই রমেশ বলে ডাকত। সম্ভবত ওটা পুরো নামের প্রথম অংশ। বয়স আনুমানিক পঁয়ত্রিশ বছর। ছোট্ট কী একটা চাকরি করতেন। স্ত্রী বীণা দেবী ও চার বছরের কন্যা সুচরিতাকে নিয়ে ছোট্ট সুখের সংসার কোনো রকমে চলে যায়। রমেশের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যায় তিনি সহ্য করতে পারতেন না। অদ্ভুত এই কারণে বললাম যে এই বৈশিষ্ট্য সচরাচর আর কারো মধ্যে দেখা যায় না। সবারই যেন, 'যা হচ্ছে হোক গে, আমার কী?' ভাব। কিন্তু রমেশ ছিল ভিন্ন। অন্যায়, দুর্নীতি দেখলেই প্রতিবাদ করতেন।

কিন্তু সে বার ঘটলো একটু ভিন্ন ঘটনা। তিনি প্রতিবাদের ছোটো পরিসর থেকে বেরিয়ে এলেন। মাতাল মাস্তান বিশু পাণ্ডার বিরুদ্ধে থানায় করলেন এফ. আই. আর। গ্রামে সকলেই বিশু পাণ্ডার বিরুদ্ধে অন্যায়, অত্যাচারে অতিষ্ট। কিন্তু ভয়ে কেউই কিছু বলতে পারে না। এফ. আই. আর এর কথাটা কানে গেল বিশু পাণ্ডার। পরের দিন রমেশবাবু কন্যা সুচরিতাকে নিয়ে খেতে বসেছেন। বীণাদেবী খাবার পরিবেশন করছেন। হঠাৎই বিশু পাণ্ডা কয়েকজন ষণ্ডামার্কা লোক নিয়ে বাড়িতে ঢুকলো। ঢুকেই ক্রূর কণ্ঠে বলল,– 'দেখুন মশাই, আপনি কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করছেন। শুনলাম থানায় নাকি এফ. আই. আর করেছেন।' রমেশবাবুও দমে যাওয়ার পাত্র নন। দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন– 'আপনিও কিছু কম বাড়াবাড়ি করছেন না। আপনার অন্যায় আর মেনে নেওয়া যায় না।' কথাটা শুনেই বিশু তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। এক হিংস্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল– 'আপনি বোধহয় আমাকে চিনে উঠতে পারেন নি। ভালোই ভালোই বলছি থানা থেকে এফ. আই. আর টা তুলে নেবেন। নইলে কিন্তু ফল ভালো হবে না।' 'বৌদি বোঝান'– বীণাদেবীর দিকে তাকিয়ে বিশু পাণ্ডা কথাটা বলে গট-গট করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। বীণাদেবী স্বামীর কাজে কোনোদিন বাধা দেননি। কিন্তু তবুও সাবধানতার জন্য স্বামীকে বললেন– 'দেখো, তোমার কাজে আমি কোনোদিন বাধা দিইনি, দিতে চাইও না। যা করবে সাবধানে করো। এই বিশু জাতীয় লোকজন কিন্তু খুব একটা ভালো না।' রমেশবাবু স্ত্রীকে আশ্বাস দেন– 'তুমি ভয় পেয়ো না, ওরা আমার কিছুই করতে পারবে না।' বাচ্চা মেয়ে সুচরিতা এই সব দেখে বাবা-মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাবাকে জিজ্ঞেস করে– 'বাবা ওরা কারা? কী বলে গেল?' মেয়েকে কোলের ওপর বসিয়ে নিয়ে রমেশবাবু বললেন– 'ওরা খুব খারাপ লোক মা, ওদের বিরুদ্ধে কথা বলেছি বলে আমাকে শাসিয়ে গেল, হুমকি দিয়ে গেল।' 'বাবা হুমকি কী?' –বাবাকে জিজ্ঞেস করে সুচরিতা। রমেশবাবু চিন্তিত দৃষ্টিতে বীণাদেবীর দিকে তাকায়। তারপর মেয়ের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বলেন– হুমকি হচ্ছে আমাকে ভয় দেখিয়ে গেল যাতে আমি ওদের অন্যায়ের প্রতিবাদ না করি। ছোট্ট মেয়েটি বাবার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শোনে। 'শোনো, তুমিও কোনোদিন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না, মেনে নেবে না।' মেয়েকে রমেশবাবু বলেন– 'অনেক বাধা বিপত্তি আসবে কিন্তু পিছিয়ে যাবে না, দমে যাবে না।' মেয়ে বাবাকে বলে – 'দেখো বাবা বড়ো হয়ে আমিও অন্যায়ের প্রতিবাদ করব।' মেয়ের কথা শুনে বাবা-মা দুজনেই হাসেন। বীণাদেবী বলেন হয়েছে– 'তোমাদের বাবা মেয়ের কথা, এইবার খাবারগুলো খেয়ে আমাকে উদ্ধার করো।'

এরপর দু-একদিন নির্বিঘ্নেই কেটে যায়। একদিন রাতের বেলা মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মাকে জিজ্ঞেস করে– 'মা বাবা কোথায়?' রান্না ঘরে কাজ করতে করতে বীণাবেদী মেয়ের কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়েন। 'তাই তো রে মা, কোথায় যে গেল মানুষটা? সেই বিকেলবেলা বেরিয়েছে, এত রাত তো কোনোদিন করেন না।' তারপর মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায়

হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন– 'চিন্তা করো না, বাবা এক্ষুণি চলে আসবে।' কিন্তু রাত বেড়ে যায়। রমেশবাবু বাড়ি ফেরেন না। বীণাদেবী আরও চিন্তিত হয়ে পড়েন। আশেপাশে খোঁজাখুজি করলেন, কিন্তু কোনো ফল হল না। পরিচিত দু-একজন বীণাদেবীকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন– 'বৌদি, চিন্তা করেন না রমেশদা ঠিক চলে আসবেন। হয়তো কোনো কাজের জন্য দেরি হচ্ছে।' রমেশবাবু ফিরলেন না। মেয়েকে কোলের কাছে নিয়ে বীণাদেবীর বিনিদ্র রাত পার হয়ে গেল। সকাল হতে না হতেই একজন দুঃসংবাদটা নিয়ে এলো– 'রমেশবাবু খুন হয়েছেন।' আকাশ ভেঙে পড়ল বীণাদেবীর উপর। এক নিকষ কালো মেঘ নেমে এলো ছোট্ট সংসারটার উপর। গ্রামের পাশেই মাঠ থেকে উদ্ধার হলো রমেশবাবুর গুলিবিদ্ধ নিথর দেহ। স্বামীর মরদেহের পাশে বীণাদেবী বসে আছেন। বাচ্চা মেয়েটা 'বাবা, বাবা, বলে কাঁদছে।' পুলিশ এলো। কিন্তু বীণাবেদী কিছুই বলল না, কিন্তু সবাই জানে এই হত্যালীলা কে বা কার করেছে। সবাই তো আর রমেশবাবু ছিল না।

এরপর দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে। বীণাদেবী তাঁর ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে দুঃখ কষ্টের মধ্যে কীভাবে জীবন যাপন করেছেন সে কথা আর নাই বা শুনলেন। সেই খুনিরা হয়তো অর্থ ও ক্ষমতার দাপটে রেহাই পেয়ে গেছে। কিন্তু বীণাদেবী তাঁর মেয়েকে মানুষ করেছেন অন্যভাবে। গড়ে তুলেছেন একজন প্রতিবাদী মানুষ হিসেবেই। সুচরিতা আজ উকিল, মস্ত বড়ো উকিল। কর্মজীবনে অনেক কেস লড়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়কে জিতিয়েছে। বাবার হত্যাকারীর মত অনেক বিশু পাণ্ডাকে শাস্তি পাইয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাবার সেই মৃত্যু সুচরিতার বারবার স্মরণে আসে, তা যেন তাকে তার কর্মে আরও শক্তি যোগায়। নিজের ঘরের ডেস্কে বাবার বাঁধানো ছোট্ট একটা ছবি। এই ছবি আজও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পথে সুচরিতার প্রেরণা।

কবিতা

তুষার ভট্টাচার্য-এর দুটি কবিতা

তুষার ভট্টাচার্য-এর দুটি কবিতা

বুকের উঠোনে

ব্যর্থতার সমস্ত বিবর্ণ পালকগুলি আমি উড়িয়ে দিই
ওই নিখিল আকাশ দিগন্তের ঠিকানায়;
তারপর হলুদ বরণ জোছনার বালুচরি
আঁচলে এঁকে দিই স্বপ্নের কারুকাজ
বুকের উঠোনে জেগে থাকা অনন্ত দুঃখের শিকড়ে
বুনে দিই সফলতার অমলতাস;
ঈশানকোণে ঝুলে থাকা শ্রাবণ মেঘের পর্দা সরিয়ে
তুলে আনি পুবালি ভোরের আলোর উদ্ভাস।

গন্তব্য

নিরাশার চোরাবালিতে প্রতি নিয়ত ডুবে যাই অন্ধকারে
একবুক শূন্যতায়;
চোখের সামনে পরবর্তী গন্তব্য বলে কোনও
কিছু নেই;
বুকের ভিতরে শুধু বিপন্নতার ঘুণপোকা নীরবে
কুরে কুরে খায় সাধ-স্বপ্নের হাড়মাস;
অথচ কথা ছিল একদিন আমি জোছনা হলুদ রাত্তির
বুক থেকে মন খারাপের উঠোনে ছড়িয়ে দেবো
ঝিলমিল নক্ষত্র স্বপ্নের কারুকাজ।

জুরাসিক বিষ

ফিরোজ অনীক

ছেনি মেরে মেরে পাহাড় খোদাই করে মানুষের
ঝুলিতে জমা হয়েছিল একটু শান্তি
আলতামিরা অজন্তার গুহায় আঁকা হয়েছিল জীবনের
কিচির মিচির

জুরাসিক যুগকে পেছনে ফেলে
তুষার যুগকে পরাস্ত করে গুহা-মানবের মানুষ হয়ে
ওঠার কোনো এক অজ্ঞাতে, মনে রয়ে গেলো পাপ

সিন্ধু নদির অদূরে বাসা গড়ল অসুর সাম্রাজ্য

সেই পাপ ভোরের ঊষায় ধুয়ে ফেলার মন্ত্র জপল ঋষি

ঋষি প্রজ্ঞায় অসুর সাম্রাজ্য হলো নাশ
হলো আঁধারের অবসান

কিন্তু সূর্যোদয় রয়ে গেলো অধরা

সিন্ধু-রোপার-হরোপ্পা-কালিবঙ্গানের ধ্বংস স্তুপে
সভ্যতার ঊষা অধীর আগ্রহে সাধনায় মগ্ন

ফুলের সৌরভে সুবাসিত সিন্ধুর তটভূমি
গুপ্ত গুহায় ফের বন্দি মানবাধিকার

হুন-পাঠান - মোগল পেরিয়ে
গোধূলি বেলায় ব্রিটিশ বণিক সেই জুরাসিক বিষ বীজ
পাকাপাকি প্রোথিত করল উপমহাদেশের আকাশ-
বাতাসে

জুরাসিক বিষ বৃক্ষের ফল টুসটুসে পরিপক্ক
সক্রেটিসের বিচার করা রাষ্ট্র নায়করা
বিভাজনী মন্ত্রে মানুষ মারে
শাসনের দিন সংখ্যা বাড়িয়ে নেয়

মানুষের সত্তায় গহনা বিচ্ছিন্ন লংকার সওদায় দেশ
চলে নিরবচ্ছিন্ন দ্বিশত বছর
অতঃপর ক্ষমতার পট বদল,
যমুনার জল প্রবহমান

উত্তর পূর্ব পশ্চিমে বিষ বৃক্ষের ফল বুনে উধাও
রাজা রানি বাদশা

তাদের উচ্ছিষ্ট মেওয়া বুভুক্ষু জারজ ভক্ষণ করে
একবিংশের তারুণ্যের লাম্পট্য
লাশ গোনে ১৭,২০,২৯
৩৮....
শুধু বিদুরের মতো
ছলছল চোখে চেয়ে রয় পশ্চিম-উত্তর-পূর্ব
সাগর-নদি-পাহাড়

যমুনার নীল জলও জুরাসিক বিষ হরণে অপারগ
তার জলে মেশে টুকটুকে লাল চাপ চাপ রক্ত

সেই রক্ত জলে স্নান করে
রক্ষ ফের ফুয়েরার হবার স্বপ্নে মশগুল

ইতিহাসের আবর্তন আর কত দেখবে তুমি?
এত বিষ! এত বিষ! এত বিষ!

বিষহরি কই?
নীলকন্ঠ তুমি আর কবে
ফিরবে?
সত্তা-মন্থনে ওঠা আগ্নেয়গিরির লাভার গরলে ছারখার
অস্তিত্ব।

তোমাকে বলছি

নীল

হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি
খুব সুড়সুড়ি পাচ্ছো তো
মনে রেখো, এই সুড়সুড়ি জার্মানরাও পেয়েছিল
কিন্তু জার্মানদের এখন সবাই চেনে
এক অত্যাচারী রাজার নামে
তার পরিণাম নিশ্চয় তুমি ভুলে যাওনি

হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি
ইন্টারনেট বন্ধ করে আন্দোলন থামাতে চাইছো
মনে রেখো, ইংরেজদের তাড়ানো হয়েছিল
বিনা ইন্টারনেটের যুগেই
সেটা নিশ্চয় তুমি ভুলে যাও নি

হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি
লাঠিচার্জ, গ্রেনেড বর্বরতা দেখে দমে যাচ্ছো
মনে রেখো, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, নেতাজীরা
কিন্তু পিছিয়ে যায়নি, দমে যায় নি
আর তার ফল আজ আমরা স্বাধীন
এটা নিশ্চয় তোমার ভুলে যাওয়ার কথা নয়

হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি
রক্ষণকামী অপশক্তির চোখ রাঙানিতে ভয় পেয়ো না
বিশ্বাস রাখো নিজের ওপর,
আন্দোলন করো মানবিক পথে,
জয় তোমার হবেই

হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি
মনে রেখো, ইতিহাস সৃষ্টি করতে
দরকার আমিত্বিক চর্চা,
আর রক্ষণকামিতা থেকে নিজের 'আমি'র মুক্তি।

বসন্ত

মিনারুল হক

মরা পাতা না ঝরালে,
ন্যাড়া গাছে কিশলয় না এলে,
খরা কাটিয়ে বারিধারা না আসিলে,
জীবনের বসন্ত আসে না,

মরা গাঙে প্লাবন না আসিলে,
পুষ্পের সুরভি না ছড়ালে,
কুহুক ডাক না শুনিলে,
জীবনের বসন্তও আসে না,

তোমার প্রতি আমার নজর না পড়িলে,
তোমার রূপে হিয়া আমার না মজিলে,
প্রেমে তোমার না পড়িলে,
জীবনের বসন্তও আসে না,

শিব-মূলে জল সিঞ্চন না করিলে,
গাঁজা ঘুম না ভাঙিলে,
দূর্গা প্রাপ্তি ঘটে না,
জীবনের বসন্তও আসে না,

গায়ের ঘাম না ঝরালে,
শ্রমের মূল্য না পাইলে,
লক্ষ্মীর পেঁচা না ডাকিলে,
জীবনের বসন্তও আসে না,

তোমার সমীপে আমি নিবেদিত না হইলে,
বদ্ধ ঘর থেকে তোমারে বাহির না করিলে,
তোমার প্রতি আমার প্রেমও জাগে না,
জীবনে মোর বসন্তও আসে না,

তোমার ডাকে সাড়া আমি না দিলে,
তোমার পথে আমি না এলে,
তোমার সাথে আমার মিতালি না হলে,
জীবনে বসন্তও আসে না,

কৃষ্ণের বাঁশি না বাজিলে,
সেই সুরে রা-ধা-ও না নাচিলে,
সুর তবে আসে না,
জীবনে মোর বসন্তও আসে না।

হক কথা

মানিক জ্যোতি দাস

এ দেশ আমার, এ দেশ তোমার
বলছি, কিন্তু করছিনা।
আমার জন্য তোমার ক্ষতি
করছি, কিন্তু ধরছিনা।
তুমি আমার দেশের মানুষ,
আমরা দেশে ভাই ভাই।
আমার স্বার্থ ক্ষুন্ন হলেই
চলবে কিন্তু ঠাই ঠাই।
তোমার কথা শুনছে কেডা,
তোমার আছে বলার কী?
গলাবাজির শক্তি এতো,
আছে তোমার গলার কি?
এ দেশখানা তোমার আমার,
মস্ত উপমহাদেশ।
জয়ধ্বজা উড়বে আমার,
পাহাড় থেকে প্রান্ত শেষ।
তোমার খানা তুমিই ভাবো,
এখানে নাক গলিও না।
তোমার জন্য জায়গাটি নেই,
একথাটি বলিও না।
আমার বাড়ি, মঠ-মন্দির,
বাপ দাদাদের জমিদারি।
আমার দিকেই লোক লস্কর,
আমার দিকেই পাল্লা ভারী।
তোমার জন্য কথা বলার,
দেখছো তো ভাই লোকটি নেই।
থাকবে বলো কেমন করে,
তোমার তেমন ভোটটি নেই।
রাজনীতিটাই বড়ো এখন,
দুর্নীতি আর শয়তানি।
সব ব্যাপারেই ধান্দাবাজি,
সবখানাতেই কাটমানি।
তোমার এতে ইন্টারেস্ট নেই,
জানি তুমি ধর্মরাজ।
কায়দা করে ফায়দা লোটা,
নয়কো তোমার কর্ম আজ।
তোমার ভাবনা তুমিই ভাবো,
পরের ভাবনা কে ভাবে?
তোমার হয়ে কথা বলে,
কয়েদ খানায় কে যাবে?
তুমি আবার দোষ দিও না,
বুঝিয়ে দিলাম সব কিছু।
এমন আমার ইচ্ছেটি নেই,
তোমায় দেখায় খুব নীচু।
এ দেশ আমার, এ দেশ তোমার,
সব অধিকার নেই মানা।
কিন্তু জেনো চাইবো যেটা,
দিতেই হবে সেইখানা।

নতুন

স্বরূপ পাল

লক্ষ বছর পার করেছি আমি
তোমার হাতেও আদিমকালের শোক
অতীত জীবন মুহূর্তে আগামী
এবার কোথাও নতুক কিছু হোক

সেই তো একই দিনের পর দিন
পাথরচাপা বয়স বাড়ার ছল
সেই তো একই সন্ধে উদাসীন
বাড়ি ফেরার গল্প অবিকল।

দেশ ভেঙেছে, ভাগ হয়েছে মন
মন ভেঙেছে, ছড়িয়ে গেছে তাস
একলা বসে পড়ব কতক্ষণ
একই গ্রহের একই ইতিহাস?

কেবল জানি, পাল্টাবে না সব
নতুন কেবল আক্রমণের পথ
উঠবে সেজে ক্ষমতা-উৎসব
হামলা নিয়ে তৈরি ভবিষ্যৎ!

এরই মধ্যে তোমায় খুঁজি আমি,
এক ঝলকের সম্ভাবনার নাম
অতীত জীবন মুহূর্তে আগামী
নইলে কি আর চিনতে পারতাম?

আমরা-আমি-তোমরা-তুমি-ওরা
এক চেহারার নানারকম মুখ
পাল্টে যাবার স্রোত চিরকাল চোরা
নিজের কাছে সবাই আগন্তুক

তাও কি শীতের আগুন জ্বালাব না?
হাত বাড়িয়ে নেব না তার আঁচ?
কান পাতলেই বাতাসে যায় শোনা
'বাঁচতে হলে বাঁচার মতো বাঁচ'!

আজ তাহলে বাঁচারই গান জ্বালি
আর একটিবার ঝলসে উঠুক চোখ
তারিখ, সে তো পাল্টে যাবে কালই
সত্যি এবার নতুন কিছু হোক।

‘অস্তিত্ব’ প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

১। অস্তিত্বঃ প্রবেশিকা (২১টি প্রবন্ধ)	১৫০.০০
২। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ এক	২০০.০০
৩। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ দুই	২০০.০০
৪। দেহমনের নিয়ন্ত্রণ এবং...	১৩০.০০
৫। জীবন দিশারী ‘অস্তিত্ব’	৩০.০০
৬। মেধা প্রতিভা কি ভাগ্য (!) বাচক? কী তার লভ্য প্রযুক্তি?	১৫০.০০
৭। দাম্পত্য প্রযৌক্তিক পরিবার সমিতি	৩০.০০
৮। বস্তু প্রযুক্তি নির্মাণী ‘অস্তিত্ব’	২৫.০০
৯। সত্তার অর্গল ভাঙাটাই মনের দরজা খোলার রহস্য	৪০.০০
১০। শ্রমমূল্যের শান্তি রথ	১০০.০০

প্রকাশক: গাইডেন্স ফাউন্ডেশন
ফোন: ০৩৩-২২৮০-৬৭০৯/৫৫০৫
১৯৭ পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৭, (পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে)
যোগাযোগ: ৯৮৩০০৬৯৫২৫
E-mail: emdadul197@gmail.com

Mob: 9735208137

MAITY BUILDERS

(Retailer, Works Contractor)

Prop:- Subhendu Maity

VILL– BANGHERI • P.O +P.S– KAKDWIP
DIST– S. 24 PARGANAS • PIN-743347.
INDIA • WEST BENGAL

Issue date 20 March 2020.
Vol. II, Issue 1 Voice mark

সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব ও রাজনৈতিক দিশাহীনতায় আর্থসমাজ অস্থির। তার লক্ষ্য নির্ণয়ে ব্যর্থ। এই সংকটাপন্ন পটভূমিতে শান্তি লক্ষ্যে– ১। অস্তিত্ব: প্রবেশিকা (২১টি প্রবন্ধ) ১৫০. ২। মানুষ: দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... (বর্তন ক্রম: এক) ২০০. ৩। মানুষ: দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... (বর্তন ক্রম: দুই) ২০০. ৪। দেহমনের নিয়ন্ত্রণ এবং ... ১২০. ৫। শ্রমমূল্যের শান্তি রথ ১০০.

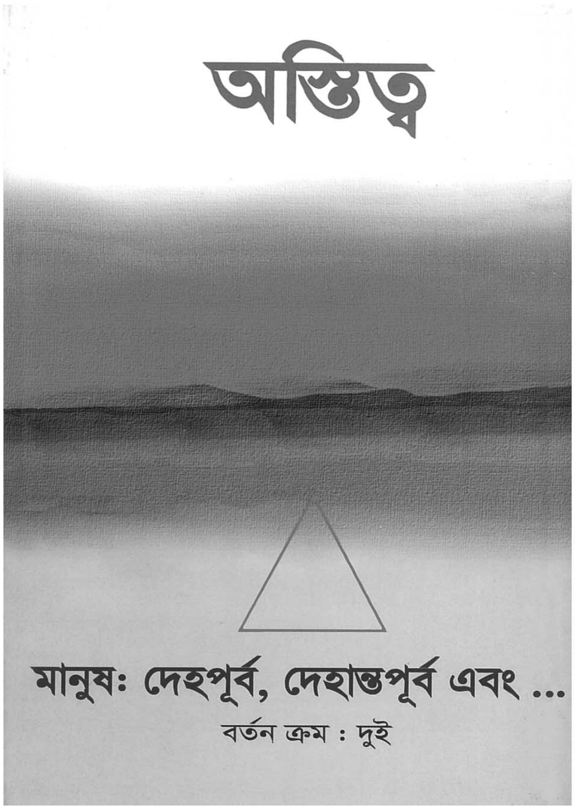

প্রকাশক: গাইডেন্স ফাউন্ডেশন
ফোন: ০৩৩-২২৮০-৬৭০৯/৫৫০৫
১৯৭ পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৭, (পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে)

Published by Md. Azad Hossain from Bhagwanpur, Ashariadaha, Lalgola, Murshidabad, Pin-742148 and printed by him at M/s. KIS Offset Press, Berhampore, Murshidabad, Pin-742101.